রাজকাহিনী

(মেবার)

প্রথম খণ্ড

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ৸৹ আনা।

প্রকাশক

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

হিতবাদী লাইব্রেরী

৭০, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস

২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

সূচী

বিষয়			পৃষ্ঠা
শিলাদিত্য	...	...	১
গোহ	...	...	১৪
বাপ্পাদিত্য	...	...	২৫
পদ্মিনী	...	...	৪৯
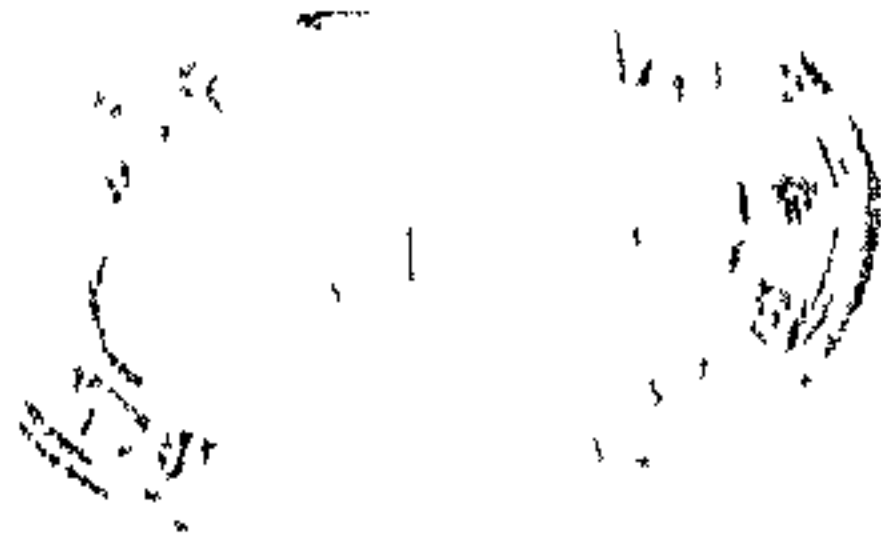
রাজকাহিনী

শিলাদিত্য

শিলাদিত্যের যখন জন্ম হয়নি, যে সময় বল্লভীপুরে রাজা কনক সেনের বংশের শেষ রাজা রাজত্ব করছিলেন, সেই সময় বল্লভীপুরে সূর্য্য-কুণ্ড নামে একটি অতি পবিত্র কুণ্ড ছিল। সেই কুণ্ডের একধারে প্রকাণ্ড সূর্য্যমন্দিরে এক অতিবৃদ্ধ পুরোহিত বাস করতেন। তাঁর একটিও পুত্র-কন্যা কিম্বা বন্ধুবান্ধব ছিল না। অনন্ত আকাশে সূর্য্যদেব যেমন একা, তেমনি আকাশের মত নীল প্রকাণ্ড সূর্য্যকুণ্ডের তীরে আদিত্যমন্দিরে সূর্য্যপুরোহিত তেজস্বী সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়ই একাকী, বড়ই সঙ্গীহীন ছিলেন। মন্দিরে দীপ-দান, ঘণ্টাধ্বনি, উদয়-অস্ত দুই সন্ধ্যা আরতি, সকল ভারই তাঁর উপর ;—ভৃত্য নাই, অনুচর নাই, একটি শিষ্যও নাই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একাই প্রতিদিন ত্রিশ সের ওজনের পিতলের প্রদীপে দুই সন্ধ্যা সূর্য্যদেবের আরতি করতেন ; প্রতিদিনই সেই শীর্ণহাতে রাজসরাজার রাজমুকুটের মত মন্দিরের প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাতেন ; আর মনে মনে ভাবতেন, যদি একটি সঙ্গী পাই তবে এই বৃদ্ধ বয়সে তার হাতে সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

সূর্য্যদেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। একদিন পৌষ মাসের প্রথমে ঘন কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার ছিল, সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন,

বৃদ্ধ পুরোহিত সন্ধ্যার আরতি শেষ করে ভীমের বুকপাটাখানার মত প্রকাণ্ড মন্দিরের লোহার কপাট বহুকষ্টে বন্ধ করছেন, এমন সময় ম্লানমুখে একটি ব্রাহ্মণকন্যা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল ;—পরনে ছিন্ন-বাস, কিন্তু অপূর্ব্ব সুন্দরী !—বোধ হল যেন শীতের ভয়ে একটি সন্ধ্যাতারা সূর্য্যমন্দিরে আশ্রয় চায় ! ব্রাহ্মণ দেখলেন কন্যাটি সুলক্ষণা, অথচ তার বিধবার বেশ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—"কে তুমি ? কি চাও ?" তখন সেই ব্রাহ্মণবালিকা কমলকলির মত ছোট দুই খানি হাত যোড় করে বল্লে,—"প্রভু আমি আশ্রয় চাই ; ব্রাহ্মণকন্যা, গুর্জ্জর দেশের বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ দেবাদিত্যের একমাত্র কন্যা আমি, নাম সুভাগা ; বিয়ের রাত্রে বিধবা হয়েছি, সেই দোষে দুর্ভাগী বলে সকলে মিলে আমাদের দেশের বার করেছে। প্রভু, আমার মা ছিলেন, এখন মাও নাই, আমায় আশ্রয় দাও।" ব্রাহ্মণ বল্লেন,—"আরে অনাথিনী, এখানে কোন্ সুখের আশায় আশ্রয় চাস্ ? আমার অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, আমি যে নিতান্ত দরিদ্র, বন্ধুহীন !"

ব্রাহ্মণ মনে মনে এই কথা বল্লেন বটে কিন্তু কে যেন তাঁর মনের ভিতর বলতে লাগল,—হে দরিদ্র, হে বন্ধুহীন, এই বালিকাকে তোমার বন্ধু কর, আশ্রয় দাও। ব্রাহ্মণ একবার মনে করলেন আশ্রয় দিই ; আবার ভাবলেন,—যে মন্দিরে আমি বৎসর ধরে একা এই সূর্য্যদেবের পূজা কল্লেম, আজ শেষ দশায় আবার কার হাতে তাঁর পূজার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। ব্রাহ্মণ ইতস্তত করতে লাগলেন। তখন সহসা সন্ধ্যার সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীর পশ্চিম পার থেকে এক বিন্দু সূর্য্যের আলো সেই দুঃখিনী বালিকার মুখখানিতে এসে পড়ল। ভগবান আদিত্যদেব যেন নিজের হাতে দেখিয়ে দিলেন,—এই আমার সেবাদাসী ; হে আমার প্রিয়ভক্ত, এই বালিকাকে আশ্রয় দাও, যেন

চিরদিন এই দুঃখিনী বিধবা আমার সেবায় নিযুক্ত থাকে। ব্রাহ্মণ যোড়হস্তে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করে, দেবাদিত্য ব্রাহ্মণের কন্যা সুভাগাকে সূর্য্যমন্দিরে আশ্রয় দিলেন।

তার পরে কতদিন কেটে গেল, সুভাগা তখন মন্দিরের সমস্ত কাযই শিখেছেন, কেবল ননীর মত কোমল হাতে ত্রিশ সের ওজনের সেই আরতির প্রদীপটা কিছুতেই তুলতে পারেন না বলে, আরতির কাযটা বৃদ্ধকেই করতে হত। একদিন সুভাগা দেখলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জীর্ণ শরীর যেন ভেঙে পড়েছে,—আরতির প্রদীপ শীর্ণ হাতে টলে পড়ছে। সেই দিন সুভাগা বল্লভীপুরের বাজারে গিয়ে একসের ওজনের একটি ছোট প্রদীপ নিয়ে এসে বল্লেন,—"পিতা, আজ সন্ধ্যার সময় এই প্রদীপে সূর্য্যদেবের আরতি করুন।" ব্রাহ্মণ একটু হেসে বল্লেন,—"সকালে যে প্রদীপে দেবতার আরতি আরম্ভ করেছি, সন্ধ্যাতেও সেই প্রদীপে দেবতার আরতি করা চাই। নূতন প্রদীপ তুলে রাখ, কাল নূতন দিনে নূতন প্রদীপে সূর্য্যদেবের আরতি হবে।" সেইদিন ঠিক দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের আলোয় যখন সমস্ত পৃথিবী আলোময় হয়ে গেছে, সেই সময় ব্রাহ্মণ সুভাগাকে সূর্য্যমন্ত্র শিক্ষা দিলেন; —যে মন্ত্রের গুণে সূর্য্যদেব স্বয়ং এসে ভক্তকে দর্শন দেন, যে মন্ত্র জীবনে একবার ছাড়া দুইবার উচ্চারণে নিশ্চয় মৃত্যু। তারপর সন্ধ্যাবেলা, সন্ধ্যার অন্ধকারে, আরতিশেষে, নিভন্ত প্রদীপের মত ব্রাহ্মণের জীবন-প্রদীপ ধীরে ধীরে নিভে গেল—সূর্য্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে অস্ত গেলেন। সুভাগা একলা পড়লেন।

প্রথম দিনকতক বৃদ্ধের জন্য কেঁদে কেঁদে কাটালেন। তারপর দিনকতক নিজের হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দিরের চারিদিকে ফলের গাছ, ফুলের গাছ লাগাতে কেটে গেল। আরও কতকদিন মন্দিরের পাথরের দেওয়াল মেজে ঘসে পরিষ্কার করে তার গায়ে লতা,

পাতা, ফুল, পাখী, হাতী, ঘোড়া, পুরাণ, ইতিহাসের পট লিখতে চলে গেল। শেষে সুভাগার হাতে আর কোন কাজ রইল না। তখন তিনি সেই ফলের বাগানে ফুলের মালঞ্চে একা একাই ঘুরে বেড়াতেন। ক্রমে যখন সেই নূতন বাগানে দুটি একটি ফল পাকতে আরম্ভ হল, দুটি একটি ফুল ফুটতে লাগল, তখন ক্রমে দু একটি ছোট পাখী, গুটিকতক রঙিন প্রজাপতি, সেই সঙ্গে একপাল ছোট বড় ছেলেমেয়ে দেখা দিলে। প্রজাপতি শুধু একটুখানি ফুলের মধু খেয়ে সন্তুষ্ট ছিল, পাখী শুধু দু একটা পাকা ফল ঠোকরাত মাত্র, কিন্তু সেই ছেলের পাল ফুল ছিঁড়ে, ফল পেড়ে, ডাল ভেঙে, চুরমার করত। সুভাগা কিন্তু কাহাকেও কিছু বলতেন না, হাসি মুখে সকল উৎপাত সহ্য করতেন। গাছের তলায় সবুজ ঘাসে নানা রঙের কাপড় পোরে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে খেলে বেড়াত, দেখতে দেখতে সুভাগার দিনগুলো আনমনে কেটে যেত। ক্রমে বর্ষা এসে পড়ল;—চারিদিকে কাল মেঘের ঘটা, বিদ্যুতের ছটা আর গুরু গুরু গর্জ্জন। সেই সময় একদিন ক্ষুরের মত পুবের হাওয়া, সুভাগার নূতন বাগানে ফুলের বোঁটা কেটে, গাছের পাতা ঝরিয়ে, তার সাধের মালঞ্চ শূন্যপ্রায় করে শন্ শন্ শব্দে চলে গেল। পাখীর ঝাঁক হাওয়ার মুখে উড়ে গেল, প্রজাপতির ভাঙা ডানা ফুলের পাপড়ির মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, ছেলের পাল কোথায় অদৃশ্য হল। সুভাগা তখন সেই ধারাশ্রাবণে একা বসে বসে বাপমায়ের কথা, শ্বশুরশাশুড়ীর নিষ্ঠুরতা, আর বিয়ের রাত্রে সুন্দর বরের হাসিমুখের কথা মনে করে কাঁদতে লাগলেন, আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন—"হায়, এই নির্জ্জনে সঙ্গীহীন বিদেশে কেমন করে সারা জীবন একা কাটাব।" হরিণের চোখের মত সুভাগার কালো কালো দুটি বড় বড় চোখ অশ্রুজলে ভরে উঠল। তিনি পুবে

দেখলেন অন্ধকার, পশ্চিমে অন্ধকার, উত্তরে দক্ষিণে চারিদিকে অন্ধকার ; মনে পড়ল এমনি অন্ধকারে এক দিন তিনি সেই মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। আজও সে দিনের মত অন্ধকার—সেই বাদলার হাওয়া, সেই নিঃশব্দ প্রকাণ্ড সূর্য্যমন্দির ; কিন্তু হায়, কোথায় আজ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যিনি সেই দুর্দ্দিনে অনাথিনী অভাগিনী সুভাগাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন! সুভাগার কালো চোখ থেকে দুটি ফোঁটা জল দুই বিন্দু বৃষ্টির মত অন্ধকারে ঝরে পড়ল। সুভাগা মন্দিরের সমস্ত দুয়ার বন্ধ করে প্রদীপ জালিয়ে ঠাকুরের আরতি করলেন ; তারপর কি জানি কি মনে করে সুভাগা সেই সূর্য্যমূর্ত্তির সম্মুখে ধ্যানে বসলেন। ক্রমে সুভাগার দুটি চক্ষু স্থির হয়ে এল, চারিদিক থেকে ঝড়ের ঝন্‌ঝনা, মেঘের কড়মড়ি, ক্রমে যেন দূর হতে বহুদূরে সরে গেল। সুভাগার মনে আর কোন শোক নাই, কোন দুঃখ নাই। তাঁর মনের অন্ধকার যেন সূর্য্যের তেজে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। সুভাগা ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শেখা সেই সূর্য্যমন্ত্র উচ্চারণ করলেন ; তখন সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল, সুভাগা যেন শুনতে পেলেন, চারিদিকে পাখীর গান, বাঁশীর তান, আনন্দের কোলাহল। তারপর গুরু গুরু গভীর গর্জ্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে, চারিদিক আলোয় আলোময় করে, সেই মন্দিরের পাথরের দেওয়াল, লোহার দরজা, যেন আগুনে আগুনে গলিয়ে দিয়ে, সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রথে কোটি কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ম্ময় আলোময় সূর্য্যদেব দর্শন দিলেন। সে আলো সে জ্যোতি মানুষের চোখে সহ্য হয় না। সুভাগা দুই হাতে মুখ ঢেকে বল্লেন,—"হে দেব, রক্ষা কর, ক্ষমা কর, সমস্ত পৃথিবী জলে যায়।" সূর্য্যদেব বল্লেন, —"ভয় নাই, ভয় নাই। বৎসে, বর প্রার্থনা কর।" বলতে বলতে সূর্য্য-দেবের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল, শুধু একটুখানি রাঙা আভা সধবার

সিঁদুরের মত সুভাগার সিঁথি আলো করে রইল। তখন সুভাগা বল্লেন,—"প্রভু আমি পতিপুত্রহীনা, বিধবা অনাথিনী, বড়ই একাকিনী, আমাকে এই বর দাও যেন এই পৃথিবীতে আমায় আর না থাকতে হয় ;—সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে আজই তোমার চরণতলে আমার মরণ হোক।" সূর্য্যদেব বল্লেন,—"বৎসে দেবতার বরে মৃত্যু হয় না, দেবতার অভিশাপে মৃত্যু হয়, তুমি বর প্রার্থনা কর।" তখন সুভাগা সূর্য্যদেবকে প্রণাম করে বল্লেন,—"প্রভু যদি বর দিলে তবে আমাকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাও, আমি তাদের মানুষ করি। ছেলেটি তোমারি মত তেজস্বী হবে, মেয়েটি হবে যেন চাঁদের কোনার মত সুন্দরী।"

সূর্য্যদেব তথাস্তু বলে অন্তর্দ্ধান করলেন। ধীরে ধীরে সুভাগার চোখে ঘুম এল, সুভাগা পাষাণের উপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়লেন। চারিদিকে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নাব্‌ল। তখন ভোর হয়ে এসেছে, সুভাগা ঘুমের ঘোরে শুনতে লাগলেন, তাঁর সেই ভাঙা মালঞ্চে দুটি ছোট পাখী কি সুন্দর গান ধরেছে! ক্রমে সকাল বেলার একটুখানি সোনার আলো সুভাগার চোখে পড়ল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন, আঁচলে টান পড়ল, চেয়ে দেখলেন কচি দুটি ছেলেমেয়ে কোলের কাছে ঘুমিয়ে আছে। সূর্য্যদেবের বর সফল হল ;—সুভাগা দেবতার মত সুন্দর সন্তান দুটি কোলে নিলেন। সকল লোকের চোখের আড়ালে নির্জ্জন মন্দিরে জন্ম হল বলে, সুভাগা দুজনের নাম দিলেন গায়েব গায়েবী।

সুভাগা গায়েব আর গায়েবীকে বুকে নিয়ে মন্দিরের বাহিরে এলেন, তখন পূবে সূর্য্যদেব উদয় হচ্ছিলেন, পশ্চিমে চাঁদ অস্ত যাচ্ছিলেন। সুভাগা দেখলেন, গায়েবের মুখে সূর্য্যের আলো ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল, আর গায়েবীর কালো চুলে চাঁদের জ্যোৎস্না ধীরে

ধীরে নিভে গেল। তিনি মনে মনে বুঝলেন, গায়েবীকে এই পৃথিবীতে বেশি দিন ধরে রাখা যাবে না।

গায়েব ক্রমশ যখন বড় হয়ে পাঠশালায় যেতে আরম্ভ করলেন, সেই সময় গায়েবী মায়ের কাছে বসে মন্দিরে কাজকর্ম্ম শিখতে লাগলেন। গায়েব যেমন দুরন্ত দুর্দান্ত, গায়েবী তেমনি শিষ্ট শান্ত। গায়েবীর সঙ্গে কত ছোট ছোট মেয়ে সেধে সেধে খেলা করতে আসত, কিন্তু গায়েবের উৎপাতে পাঠশালার সকল ছেলে অস্থির হয়ে উঠেছিল। শেষে তারা সকলে মিলে একদিন পরামর্শ করলে,—গায়েব আমাদের চেয়ে লেখায়, পড়ায়, গায়ের জোরে, সকল বিষয়ে বড়; এস আমরা সকলে মিলে গায়েবকে রাজা করি, আর আমরা তার প্রজা হই; তাহলে গায়েব আর আমাদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। এই বলে সকলে মিলে গায়েবকে রাজা বলে কাঁধে করে নৃত্য আরম্ভ করলে। গায়েব হাসিখুসিতে সেই সকল ছোট ছোট ছেলের কাঁধে বসে আছেন, এমন সময় একটি খুব ছোট ছেলে বলে উঠল,—"আমি রাজার পূজারী। মন্ত্র পড়ে গায়েবকে রাজটীকা দেব।" তখন সেই ছেলের পাল গায়েবকে একটা মাটির ঢিবির উপর বসিয়ে দিলে। গায়েব সত্যি রাজার মত সেই মাটির সিংহাসনে বসে আছেন, এমন সময়, সেই ছোট ছেলেটি তাঁর কপালে তিলক টেনে দিয়ে বল্লে, —"গায়েব তোমার নাম জানি, বল তোমার মায়ের নাম কি, বাপের নাম কি?" গায়েব বল্লেন,—"আমার নাম গায়েব, আমার বোনের নাম গায়েবী, মায়ের নাম সুভাগা। আমার বাপের নাম—কি?" গায়েব জানেননা যে তিনি সূর্য্যদেবের বরপুত্র। নাম বলতে পারলেন না, লজ্জায় অধোবদন হলেন, চারিদিকে ছেলের পাল হো হো হাততালি দিতে লাগল, লজ্জায় গায়েবের মুখ লাল হয়ে উঠল। তখন এক পদাঘাতে সেই মাটির

সিংহাসন চূর্ণ করে, চড়ে চাপড়ে ছোট ছেলেদের ফোলাগাল বেশি করে ফুলিয়ে, রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গায়েব একেবারে দেবমন্দিরে উপস্থিত হলেন। সুভাগা গায়েবীর হাতে পিতলের একটি ছোট প্রদীপ দিয়ে কেমন করে সূর্য্যদেবের আরতি করতে হয় শিখিয়ে দিচ্ছিলেন; এমন সময় ঝড়ের মত গায়েব এসে পিতলের সেই প্রদীপটা কেড়ে নিয়ে টান মেরে ফেলে দিলেন। নিরেট পিতলের প্রদীপ পাথরের দেওয়ালে লেগে ঝন্ ঝন্ শব্দে চুরমার হয়ে গেল, সেই সঙ্গে সূর্য্যদেবের মুর্ত্তি লেখা একখানা কালো পাথর সেই দেওয়াল থেকে খসে পড়ল। সুভাগা বল্লেন—"আরে উন্মাদ, কি করলি? সূর্য্যদেবের মঙ্গল আরতি ছারখার করে দেবতার অপমান করলি?" গায়েব বল্লেন,—"দেবতাও বুঝিনে, সূর্য্যও বুঝিনে, বল আমি কার ছেলে? না হলে আজ তোমার সূর্য্যমূর্ত্তি কুণ্ডের জলে ডুবিয়ে দেব।" যদিও প্রকাণ্ড সেই সূর্য্যমূর্ত্তি ভীম এলেও তুলতে পারতেন না, তবু গায়েবের বীরদর্প দেখে সুভাগার মনে হল,—কি জানি কি করে! তিনি তাড়াতাড়ি গায়েবের দুটি হাত ধরে বল্লেন,—"বাছা শান্ত হ, স্থির হ, আর সূর্য্যদেবের অপমান করিসনে; পিতার নামে কি কায? আমি তোর মা আছি, গায়েবী তোর বোন, আর তোর কিসের অভাব?" গায়েব তখন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লেন,—"তবে কি মা, আমি নীচ, জঘন্য অপবিত্র, পথের ধুলা, ভিখারীর অধম?" কথাগুলো তীরের মত সুভাগার বুকে বাজল, তিনি দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন; মনে মনে ভাবলেন,—হায় ভগবান, কি করলে? এ দুরন্ত ছেলেকে কেমন করে বোঝাই, কি বলে প্রবোধ দিই? গায়েব গায়েবী নীচ নয়, অপবিত্র নয়, সূর্য্যের সন্তান, সকলের চেয়ে পবিত্র, একথায় কে বিশ্বাস করবে? সুভাগার সূর্য্যমন্ত্রের কথা একবার মনে হল, কিন্তু যখন ভাবলেন যে দুইবার মন্ত্র উচ্চারণ করলে

নিশ্চয় মৃত্যু—এই কটি বয়সে গায়েব গায়েবীকে একা ফেলে পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মত চলে যেতে হবে,—তখন তাঁর মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠল। সুভাগা বল্লেন,—"বাছা কথা রাখ্, ক্ষান্ত দে, চল্ আমরা অন্য দেশে চলে যাই, সূর্য্যদেবকেই তোদের পিতা বলে জেনে রাখ্।" গায়েব ঘাড় নাড়লেন; বিশ্বাস হয় না। তখন সুভাগা বল্লেন,—"তবে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ কর্, এখনি তোদের পিতাকে দেখতে পাবি, কিন্তু হায় আমাকে আর ফিরে পাবি না।" সুভাগার দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল। গায়েবী বল্লে,—"ভাই, মাকে কেন কষ্ট দাও?" গায়েব উত্তর না দিয়ে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিলেন। সুভাগা দুজনের হাত ধরে সূর্য্যমূর্ত্তির সম্মুখে গিয়ে ধ্যানে বসলেন। এই মন্দিরে একাকিনী সুভাগা একদিন মৃত্যু ইচ্ছা করে যে মন্ত্র নির্ভয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, কালসর্পের মত সেই সূর্য্যমন্ত্র আজ উচ্চারণ করতে তাঁর মায়ের প্রাণে কতই ভয়, কত ব্যথা! সূর্য্যদেব দর্শন দিলেন, —সমস্ত মন্দির যেন রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন। সুভাগা বল্লেন,—"প্রভু গায়েব গায়েবী কার সন্তান?" সূর্য্যদেব একটিও কথা কইলেন না। দেখতে দেখতে সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজে ভিখারিণী সুভাগার সুন্দর শরীর জলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গায়েবী কেঁদে উঠল,—'মা, মা'। গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন,—'মা কোথা?' সূর্য্যদেব কোনই উত্তর করলেন না, কেবল পাষাণের উপর সেই রাশীকৃত ছাই দেখিয়ে দিলেন। গায়েব বুঝলেন,—মা আর নাই। রাগে দুঃখে তাঁর চোখে আগুন ছুটল। গায়েব মন্দিরের কোন্ থেকে সূর্য্যমূর্ত্তি লেখা সেই পাথর খানা কুড়িয়ে সূর্য্যদেবকে ফেলে মারলেন। যমরাজের মহিষের মাথাটার মত সেই কালো পাথর সূর্য্যদেবের মুকুটে লেগে জ্বলন্ত কয়লার মত এক দিকে ঠিকরে পড়ল,—সঙ্গে সঙ্গে গায়েব মূর্চ্ছিত হলেন।

অনেকক্ষণ পরে গায়েব যখন জেগে উঠলেন তখন সূর্য্যদেব অন্তর্দ্ধান করেছেন, মাথাব কাছে শুধু গায়েবী বসে আছে। গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন,—"সূর্য্যদেব কোথায় ?" গায়েবী তখন সেই কালো পাথর খানা দেখিয়ে বল্লে,—"ওই লও ভাই আদিত্যশিলা। এই পাথর তুমি যার উপর ফেলবে তাঁর নিশ্চয় মৃত্যু। সূর্য্যদেব এটি তোমায় দিয়ে গেছেন, আর বলেছেন তুমি তাঁরই ছেলে, আজ থেকে তোমার নাম হল শিলাদিত্য। তোমার বংশ সূর্য্যবংশ নাম নিয়ে পৃথিবী শাসন কববে, আর তুমি মনে মনে ডাকলেই ওই সূর্য্যকুণ্ড থেকে সাতটা ঘোড়ার পিঠে সূর্য্যের রথ তোমার জন্যে উঠে আসবে। রথের নাম সপ্তাশ্বরথ। যাও ভাই সপ্তাশ্বরথে আদিত্যশিলা হাতে পৃথিবী জয় করে এস।" গায়েব বল্লেন, —"তোকে কোথা রেখে যাব বোন্ ?" গায়েবী বল্লে,—"ভাই, আমাকে এই মন্দিরে বন্ধ করে রেখে যাও, আমি বাগানের ফল, কুণ্ডের জল খেয়ে জীবন কাটাব। তারপর তুমি যখন রাজা হবে, আমায় এই মন্দির থেকে রাজবাড়ীতে নিয়ে যেও।"

গায়েব মহা আনন্দে গায়েবীকে সেই মন্দিরে বন্ধ রেখে সাত ঘোড়ার রথে পৃথিবী জয় করতে চলে গেলেন। আর গায়েবী সেই রানীকৃত ছাই সূর্য্যকুণ্ডের জলে ঢেলে দিয়ে 'মাবে ভাইরে' বলে পাষাণের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

সেই দিন গভীর রাত্রে যখন আকাশে তারা ছিল না, পৃথিবীতে আলো ছিল না, সেই সময় হঠাৎ সেই সূর্য্যমন্দির ঝন্ ঝন্ শব্দে একবার কেঁপে উঠল। তারপর আশি মণ কালো পাথরের প্রকাণ্ড সূর্য্যমূর্ত্তিকে নিয়ে, আর ননীর পুতুলের মত সুন্দরী গায়েবীকে নিয়ে, আধখানা মন্দির ক্রমে মাটির নীচে চলে যেতে লাগল। গায়েবী প্রাণভয়ে পালাবার চেষ্টা কল্লে—বৃথা চেষ্টা। গায়েবী দেওয়াল ধরে

সূর্য্যমন্দিরদ্বারে শিলাদিত্য

ওঠবার চেষ্টা করলে, পাথরের দেওয়ালে পা রাখা যায় না,—কাঁচের সমান। তখন গায়েবী 'ভাইরে' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর সব শেষ, সব অন্ধকার!

কতদিন চলে গেছে, গায়েব সেই সপ্তাশ্বরথে পৃথিবী ঘুরে দেশবিদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে, রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে, শেষে বল্লভীপুরের রাজাকে সেই আদিত্যশিলা দিয়ে সম্মুখযুদ্ধে সংহার করে, শিলাদিত্য নাম নিয়ে, রাজসিংহাসনে বসে, পাঠশালার সঙ্গীদের কাউকে মন্ত্রী, কাউকে বা সেনাপতি করে, যত নিষ্কর্ম্মা বুড়ো কর্ম্মচারীদের তাড়িয়ে দিলেন। তারপর হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির মাঝখানে শিলাদিত্য, চন্দ্রাবতী নগরের রাজকন্যা পুষ্পবতীকে বিয়ে করে, শ্বেতপাথরের শয়নমন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। ক্রমে রাত্রি যখন গভীর হল, কোন দিকে সাড়া শব্দ নাই, পায়ের কাছে চামরধারিণী চামর হাতে ঢুলে পড়েছে, মাথার শিয়রে সোনার প্রদীপ নিভ নিভ হয়েছে, সেই সময় শিলাদিত্য তাঁর সেই ছোট বোন গায়েবীর কচি মুখখানি স্বপ্নে দেখলেন;—তাঁর মনে হল যেন অনেক অনেক দূরে থেকে সেই মুখখানি তাঁর দিকে চেয়ে আছে; আর যেন সেই সূর্য্যমন্দিরের দিক থেকে কে যেন ডাকছে—"ভাইরে, ভাইরে, ভাইরে।"

শিলাদিত্য চীৎকার করে জেগে উঠলেন। তখন ভোর হোয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ রথে চড়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে সূর্য্যমন্দিরে উপস্থিত হলেন; দেখলেন, ভীমের বর্ম্ম দুই থানার মত মন্দিরের দুখানা কবাট একবারে বন্ধ;—কত কালের লতা পাতা সেই মন্দিরের দুয়ার যেন লোহার শিকলে বেঁধে রেখেছে। শিলাদিত্য নিজের হাতে সেই লতা পাতা সরিয়ে মন্দিরের দুয়ার খুলে ফেল্লেন;—দিনের আলো পেয়ে এক ঝাঁক বাদুড় ঝটাপট্ করে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। শিলাদিত্য মন্দিরে

প্রবেশ কল্লেন; চেয়ে দেখলেন, যেখানে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি ছিল সেখানে প্রকাণ্ড একখানা অন্ধকার কালো পর্দ্দার মত সমস্ত ঢেকে রেখেছে। শিলাদিত্য ডাকলেন 'গায়েবী! গায়েবী! কোথায় গায়েবী?' অন্ধকার থেকে উত্তর এল—'হায় গায়েবী, কোথা গায়েবী'! শিলাদিত্য মশাল আনতে হুকুম দিলেন; সেই মশালের আলোয় শিলাদিত্য দেখলেন,—উত্তর দিকটা শূন্য করে সূর্য্যমূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের আধখানা যেন পাতালে চলে গেছে, কেবল কালো পাথরের সাতটা ঘোড়ার মুণ্ডু বাসুকির ফণার মত মাটির উপর জেগে আছে। যে ঘরে শিলাদিত্য গায়েবীর সঙ্গে খেলা করেছেন, যে ঘরে সারাদিন খেলার পর দুটি ভাই বোন্ গুর্জ্জরদেশের গল্প শুনতে শুনতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন, যেখানে দেবদারু গাছের মত পিতলের সেই আরতি-প্রদীপ ছিল, সে সকল ঘরের চিহ্নমাত্র নাই। শিলাদিত্য সেই প্রকাণ্ড গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলেন 'গায়েবী গায়েবী'! তাঁর সেই করুণ স্বর, সেই অন্ধকার গহ্বরে ঘুরে ফিরে ক্রমে দূর থেকে দূরে, পাতালের মুখে চলে গেল। গায়েব নিশ্বাস ফেলে রাজমন্দিরে ফিরে এলেন।

সেই দিন রাজ-আজ্ঞায় রাজ-কর্ম্মকারেরা পুরু সোনার পাত দিয়ে সেই প্রকাণ্ড মন্দির আগাগোড়া মুড়ে দিতে লাগল। শিলাদিত্য সে মন্দিরে আর অন্য মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন না। সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে সূর্য্যের ঘোড়াগুলি যেমন আধখানা জেগেছিল তেমনিই রইল। তারপর শিলাদিত্য পাহাড় কেটে শ্বেতপাথর আনিয়ে, সূর্য্যকুণ্ডের চারিদিক সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিলেন। যখনি কোন যুদ্ধ উপস্থিত হত, শিলাদিত্য সেই সূর্য্যকুণ্ডের তীরে সূর্য্যের উপাসনা করতেন; তখনি তাঁর জন্য সপ্তাশ্বরথ জল থেকে উঠে আসত। শিলাদিত্য সেই রথে যখন যে যুদ্ধে গিয়েছেন, সেই যুদ্ধেই তাঁর জয় হয়েছে। শেষে একজন বিশ্বাস-ঘাতক

মন্ত্রী, যাকে তিনি সব চেয়ে বিশ্বাস করতেন, সব চেয়ে ভাল বাসতেন, সেই তাঁর সর্ব্বনাশ করলে। সেই মন্ত্রী ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জানতনা যে শিলাদিত্যের জন্য সূর্য্যকুণ্ড থেকে সপ্তাশ্বরথ উঠে আসে।

সিন্ধুপারে খ্যামনগর থেকে পারদ নামে অসভ্য একদল যবন যখন বল্লভীপুর আক্রমণ করলে, তখন সেই বিশ্বাসঘাতক, তুচ্ছ পয়সার লোভে সেই অসভ্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, গোরক্তে সেই পবিত্র কুণ্ড অপবিত্র করলে। শিলাদিত্য যুদ্ধের দিন যখন সেই সূর্য্যকুণ্ডের তীরে সূর্য্যের উপাসনা করতে লাগলেন, তখন আগেকার মত নীল জল ভেদ করে দেবরথ উঠে এলনা। শিলাদিত্য সাতটা ঘোড়ার সাতটা নাম ধরে বারবার ডাকলেন, কিন্তু হায়, কুণ্ডের জল যেমন স্থির তেমনিই রইল। শিলাদিত্য হতাশ হয়ে রাজরথে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধেই তাঁর প্রাণ গেল। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সূর্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের বরপুত্র শিলাদিত্য অস্ত গেলেন। বিধর্ম্মী শত্রু সোনার মন্দির চূর্ণ করে বল্লভীপুর ছারখার করে চলে গেল।

গোহ

প্রকাণ্ড বটগাছের মাঝে পাতায় ঢাকা ছোটখাট পাখীর বাসাটি যেমন, গগনস্পর্শী বিন্ধ্যাচলের কোলে চন্দ্রাবতীর শ্বেত পাথরের রাজপ্রাসাদও তেমনি সুন্দর,—তেমনি মনোরম ছিল। ম্লেচ্ছদের সঙ্গে যুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে শিলাদিত্য একদিন জনকতক রাজপুত বীরকে সঙ্গে দিয়ে চন্দ্রাবতীর রাজকন্যা গর্ভবতী রাণী পুষ্পবতীকে সেই চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে বাপ মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মনে বড় ইচ্ছা ছিল যে যুদ্ধের পর শীতকালটা বিন্ধ্যাচলের শিখরে নির্জ্জনে সেই শ্বেত পাথরের প্রাসাদে রাণী পুষ্পবতীকে নিয়ে আরামে কাটাবেন; তারপর রাণীর ছেলে হলে দুজনে একসঙ্গে রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে বল্লভীপুরে ফিরবেন। কিন্তু হায়, বিধাতা সে সাধে বাদ সাধলেন, বিধর্ম্মী শত্রুর বিষাক্ত একটা তীর তাঁর প্রাণের সঙ্গে বুকের সমস্ত আশা বিদীর্ণ করে বাহির হয়ে গেল;—শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন। তাঁর আদরের মহিষী পুষ্পবতী চন্দ্রাবতীর সুন্দর প্রাসাদে একাকিনী পড়ে রইলেন।

বিন্ধ্যাচলের গায়ে রাজ-অন্তঃপুরে যেদিকে পুষ্পবতীর ঘর ছিল, ঠিক তার সম্মুখে, পাহাড় থেকে পঞ্চাশ গজ নীচে, বল্লভীপুরে যাবার পাকা রাস্তা। পুষ্পবতী সেইবার চন্দ্রাবতীতে এসে, যত্ন করে নিজের ঘর খানির ঠিক সম্মুখে, দেওয়ালের মত সমান সেই পাহাড়ের গায়ে, পঁচিশ গজ উপরে, যেন শূন্যের মাঝখানে, ছোট একটি শ্বেত পাথরের বারাণ্ডা বসিয়েছিলেন। সেইখানে বসে, সেই রাস্তার দিকে চেয়ে, তিনি প্রতিদিন একখানি রূপার চাদরে সোনার সুতোয় সবুজ রেশমে, সবুজ ঘোড়ায় চড়া সূর্য্যের মূর্ত্তি সোনার ছুঁচ দিয়ে সেলাই করতেন আর মনে মনে

শিলাদিত্যের দূত
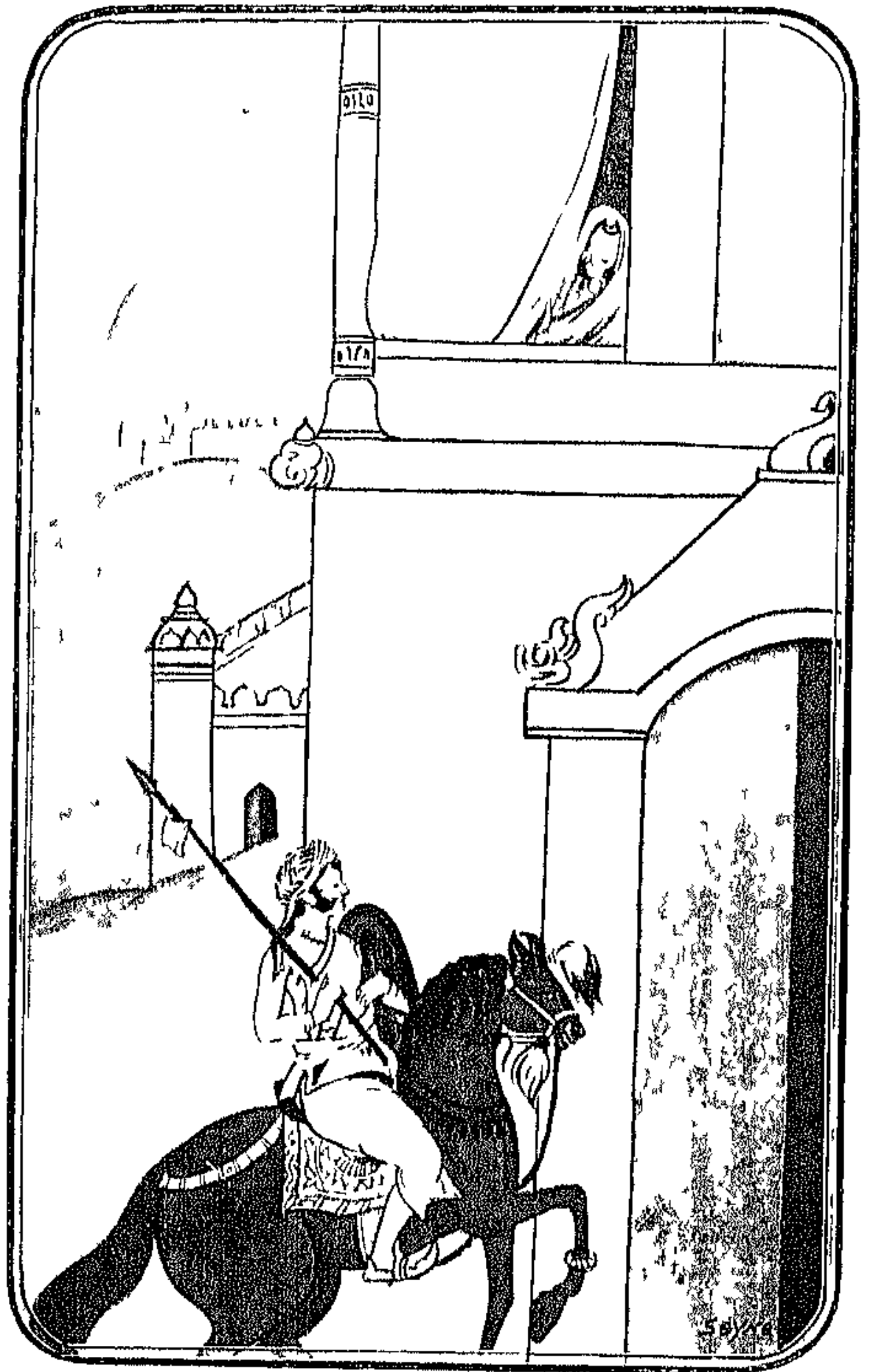
ভাবতেন,—মহারাজা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে, পাখীর পালকের মত হাল্কা এই পাগড়িটি মহারাজের মাথায় নিজের হাতে বেঁধে দেব। তারপর দুজনে মিলে পঁচিশ গজ ভাঙনের গায়ে—পাতলা একখানি মেঘের মত সাদা—শ্বেতপাথরের সেই বারাণ্ডায় বসে মহারাজার মুখে যুদ্ধের গল্প শুনব।

মাঝে মাঝে পুষ্পবতী দেখতেন, সেই বল্লভীপুরের রাস্তার বহুদূরে একটি বল্লমের মাথা ঝক্‌মক্‌ করে উঠত; তারপর কাল ঘোড়ার পিঠে বল্লভীপুরের রাজদূত দূর থেকে হাতের বল্লম মাটির দিকে নামিয়ে অন্তঃপুরের বারাণ্ডায় রাজরাণী পুষ্পবতীকে প্রণাম করে তীরবেগে চন্দ্রাবতীর সিংহদ্বারের দিকে চলে যেত। সেইদিন দাসীর হাতে মহারাজা শিলাদিত্যের চিঠি পুষ্পবতীর কাছে আসত, পুষ্পবতী সেদিন সমস্ত কাজ ফেলে শূন্যের উপরে সেই বারাণ্ডায় মহারাজার চিঠি হাতে করে বসে থাকতেন। সেই আনন্দের দিনে যখন কোন বুড়ো জাঠ গান গেয়ে মাঠের দিকে যেতে যেতে, কোন রাখালবালক পাহাড়ের নীচে ছাগল চরাতে চরাতে, চন্দ্রাবতীর রাজকুমারীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করত, তখন পুষ্পবতী কারো হাতে এক ছড়া পান্নার চিক, কারো হাতে বা এক গাছা সোনার মল ফেলে দিতেন।

রাজকুমারীর প্রসাদ মাথায় ধরে হাজার হাজার আশীর্ব্বাদ করতে করতে সেই সকল রাজভক্ত প্রজা সকাল বেলায় কাজে যেত, সন্ধ্যাবেলায় সেই রাজদূত সেই কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লম হাতে মহারাণী পুষ্পবতীর চিঠি নিয়ে বল্লভীপুরের দিকে ফিরে যেত।

পুষ্পবতী নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় পাহাড়ে পাহাড়ে কালো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পেতেন,—কখন বা কোন বুড়ো জাঠের মেঠো গান আর সেই সঙ্গে রাখাল বালকের মিষ্টি সুর সন্ধ্যার হাওয়ায়

ভেসে আসত। তারপর বিন্ধ্যাচলের শিখরে বিন্ধ্যবাসিনী ভবানীর মন্দিরে সন্ধ্যাপূজার ঘোর ঘণ্টা বেজে উঠত, তখন পুষ্পবতী মহারাজের সেই চিঠি খোঁপার ভিতর লুকিয়ে রেখে, পাটের সাড়ি প'রে দেবীর পূজায় বসতেন; আর মনে মনে বলতেন,—"হে মা চামুণ্ডে, হে মা ভবানী, মহারাজকে ভালয় ভালয় যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আন। ভগবতী আমার যে ছেলে হবে সে যেন মহারাজেরই মত তেজস্বী হয়, আর তাঁরই মত যেন নিজের রাণীকে খুব ভাল বাসে।"

হায়, মানুষের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না! পুষ্পবতী রাজারই মত তেজস্বী ছেলে পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে যে বড় সাধ ছিল—সেই শ্বেত পাথরের বারাণ্ডায় বসে মহারাজার মুখে যুদ্ধের গল্প শুনবেন,—তাঁর যে বড় সাধ ছিল,—নিজের হাতে মহারাজের মাথায় হাওয়ার মত পাতলা সেই সুন্দর চাদরখানি জড়িয়ে দেবেন;—সে সাধ কোথায় পূর্ণ হল? তাঁর সে মনের ইচ্ছা মনেই রইল, এ জন্মে আর মহারাজের সঙ্গে দেখা হল না।

যেদিন বল্লভীপুরে শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন, সেইদিন চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে রাণী পুষ্পবতী মায়ের কাছে বসে সেই রূপার চাদরে ছুঁচের কাজ করছিলেন। কাজ প্রায় শেষ হয়েছিল, কেবল সূর্য্যমূর্ত্তির নীচে সোনার অক্ষরে শিলাদিত্যের নামটি লিখতে বাকি ছিল মাত্র। পুষ্পবতী যত্ন করে নিজের কালো চুলের চেয়ে সিহি, আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল, একগাছি সোনার তার, সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র, আর চাঁপার কলির মত পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বোলতার হুলের মত বিঁধে গেল। যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন, একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মত পরিষ্কার সেই রূপার চাদরে রাঙা এক টুক্‌রো মনির মত

ঝক্ ঝক্ করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্ম্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন; জলের ছিটে পেয়ে সেই একবিন্দু রক্ত ক্রমশ ক্রমশ বড় হয়ে, একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদর খানি রক্তময় করে ফেল্লে। সেই রক্তের দিকে চেয়ে পুষ্পবতীর প্রাণ কেঁপে উঠল; তিনি ছলছল চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বল্লেন,—"মা আমাকে বিদায় দাও, আমি বল্লভীপুরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ কেমন করছে, বুঝিবা সেখানে কি সর্ব্বনাশ ঘটল!" রাজরাণী বল্লেন,—"আর ক'টা দিন থেকে যা, ছেলেটি হয়ে যাক্।" পুষ্পবতী বল্লেন,—"না না, না মা!"

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা বল্লভীপুরের আশী জন রাজপুত বীর, আর দুইটা উটের পিঠে নীল রেশমে মোড়া একখানি ছোট ডুলি বড় রাস্তা ধরে বল্লভীপুরের দিকে চলে গেল। চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদ শূন্য করে রাজকুমারী পুষ্পবতী বিদায় নিলেন।

চন্দ্রাবতী থেকে বল্লভীপুর যেতে হলে প্রকাণ্ড একটা মরুভূমি পার হতে হয়। মালিয়া পাহাড়ের নীচে বীরনগর পর্য্যন্ত চন্দ্রাবতীর পাকা রাস্তা, তারপর মরুভূমির উপর দিয়ে আগুনের মত বালি ভেঙে, উটে চড়ে বল্লভীপুর যেতে হয়, আর অন্য পথ নেই। পুষ্পবতী সেই পথের শেষে মরুভূমির সম্মুখে এসে শুনতে পেলেন যে, শিলাদিত্য আর নাই; বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ বল্লভীপুর ধ্বংস করেছে। পুষ্পবতীর চোখে এক ফোঁটা জল পড়ল না, তাঁর মুখে একটিও কথা সরল না; কেবল তাঁর বুকের ভিতরটা সম্মুখের সেই মরুভূমির মত ধূ ধূ করতে লাগল। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার হীরের গহনা গা থেকে খুলে বালির উপর ছড়িয়ে দিলেন, সিঁথের সিন্দুর মুছে ফেল্লেন। তারপর উদাস প্রাণে বিধবার বেশ ধরে

শিলাদিত্যের আদরের মহিষী পুষ্পবতী, সন্ন্যাসিনীর মত সেই মালিয়া পাহাড়ের প্রকাণ্ড গহ্বরে আশ্রয় নিলেন।

গরুপারে দশমাস দশদিন পূর্ণ হলে সন্ন্যাসিনী রাণীর কোলে, অন্ধকার গুহায়, রাজপুত্রের জন্ম হল; নাম রইল গোহ। রাণী পুষ্পবতী সেই দিনই বীরনগর থেকে তাঁর ছেলেবেলার প্রিয়সখী ব্রাহ্মণী কমলাবতীকে ডেকে পাঠিয়ে, সেই আশী জন রাজপুত বীরের সম্মুখে তাঁর বড় সাধের রাজপুত্র গোহকে সঁপে দিয়ে বল্লেন,—"প্রিয় সখি, তোমার হাতে আমার গোহকে সঁপে দিলুম, তুমি মায়ের মত একে মানুষ করো; তোমায় আর কি বলব ভাই, দেখো রাজপুত্রকে কেউ না অযত্ন করে; আর ভাই যখন চিতার আগুনে আমার এই দেহ ছাই হয়ে যাবে, তখন আমার সেই এক মুঠ ছাই কার্তিক পূর্ণিমায় কাশীর ঘাটে গঙ্গাজলে ঢেলে দিও;—যেন আমাকে জন্মান্তরে আর না বিধবা হতে হয়।" ঝর ঝর করে কমলাবতীর চোখে জল পড়তে লাগল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা সেই আশী জন রাজভক্ত রাজপুত চন্দনের কাঠে চিতা জ্বালিয়ে চারিদিক ঘিরে দাঁড়াল; শিলাদিত্যের মহিষী, রাজপুত-রাণী, সন্ন্যাসিনী, সতী পুষ্পবতী হাসিমুখে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুলের মত সুন্দর পুষ্পবতীর কোমল শরীর পুড়ে ছাই হল। চারিদিকে রব উঠল,—'জয় মহারাণীর জয়, জয় সতীর জয়!"
কমলাবতী ঘুমন্ত গোহকে এক কোলে, আর সেই ছাই-মুঠো এক হাতে নিয়ে, চক্ষের জল মুছতে মুছতে বীরনগরে ফিরে গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে সেই আশী জন রাজপুতবীর রাজপুত্রকে ঘিরে সেইদিন থেকে বীরনগরে বাসা নিলেন।

চন্দ্রাবতীর রাজা, রাণী অনেকবার গোহকে চন্দ্রাবতীতে নিয়ে যেতে

চেয়ে ছিলেন, কিন্তু বল্লভীপুরের তেজস্বী সেই রাজপুত বীরের দল গোহকে কিছুতেই ছেড়ে দেন নাই। তাঁরা বলতেন,—"আমাদের মহারাণী আমাদের হাতে রাজপুত্রকে সঁপে গেলেন, আমরাই তাঁকে পালন করব। বল্লভীপুরের রাজকুমার বল্লভীপুরের রাজপুতদের রাজা হয়ে এই মরুভূমিতেই থাকুন। এই তাঁর রাজপ্রাসাদ।"

গোহ সেই বীরনগরে কমলাবতীর ঘরে মানুষ হতে লাগলেন। কমলাবতী গোহকে ব্রাহ্মণের ছেলের মত নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত করতে চেষ্টা করতেন; কিন্তু বীরের সন্তান গোহের লেখাপড়া পছন্দ হলনা, তিনি বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, কোন দিন ভীলদের সঙ্গে ভীল বালকের মত, কোন দিন বা সেই রাজপুত বীরদের সঙ্গে রাজার মত, কখন ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমির উপর সিংহ শিকার কোরে, কখন বা জাল ঘাড়ে বনে বনে হরিণের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন।

মালিয়া পাহাড়ের নীচে বীরনগর। সেখানে যত শিষ্ট, শান্ত, নিরীহ ব্রাহ্মণের বাস; আর পাহাড়ের উপরে যেখানে বাঘ ডেকে বেড়ায়, হরিণ চরে বেড়ায়, যেখানে অন্ধকারে সাপের গর্জ্জন, দিবারাত্রি ঝরণার ঝর্ঝর, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফুলের গন্ধ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনের ছায়া, সেখানে সেই সকল অন্ধকার বনে বনে, ভীলরাজ মাণ্ডলিক, সাপের মত কালো, বাঘের মত জোরাল, সিংহের মত তেজস্বী, অথচ ছোট একটি ছেলের মত সত্যবাদী, বিশ্বাসী, সরলপ্রাণ ভীলের দল নিয়ে রাজত্ব করতেন।

গোহ একদিন সেই সকল ভীল-বালকদের সঙ্গে ভীল রাজত্বে ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে বল্লম হাতে বাঘের ছালপরা হাজার হাজার ভীলবালক, ঘোড়ায় চড়া সেই রাজপুত রাজকুমারকে ঘিরে "আমাদের রাজা এসেছে রে,—রাজা এসেছে রে", বলে মাদোল বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ক্রমে সেই ছেলের পাল

গোহকে নিয়ে রাজবাড়িতে উপস্থিত হল। তখন খোড়ো চালের রাজবাড়ি থেকে ভীলদের রাজা বুড়ো মাণ্ডলিক বেরিয়ে এসে বল্লেন,—"আরে কোথায়রে তোদের নতুন রাজা?" ছেলের পাল গোহকে দেখিয়ে দিলে। তখন সেই বুড়ো ভীল গোহকে অনেকক্ষণ দেখে বল্লেন,—"ভালরে ভাল, নতুন রাজাব কপালে তিলক লিখে দে।" তখন একজন ভীল বালক নিজেব আঙুল কেটে, বুড়ো রাজা মাণ্ডলিকের সামনে, রক্তের ফোঁটা দিয়ে গোহেব কপালে রাজ-তিলক টেনে দিলে;—ভীলদের নিয়মে সে রক্তেব তিলক মুছে দেয় এমন সাধ্য কাবো নাই।

গোহ সত্য সত্যই রাজা হয়ে ভীলদের রাজসভায় বুড়ো বাজার কাঠের রাজসিংহাসনেব ঠিক নীচে একখানি ছোট পিঁড়ির উপর বসলেন। এই পিঁড়িখানি অনেকদিন শূন্য পড়ে ছিল; কারণ মাণ্ডলিক চিরদিন নিঃসন্তান। তাঁর দীনদুঃখী সামান্য প্রজা, তাদের ঘর-আলো-কবা কালো বাঘের মত কালো ছেলে; কিন্তু হায় রাজার ঘর চিরদিন অন্ধকার, চিরকাল শূন্য ছিল। সেদিন যখন সমস্ত ভীলদের মধ্যস্থলে রক্তের তিলক পোরে গোহ যুবরাজ হয়ে পিঁড়েয় বসলেন, তখন বুড়ো মাণ্ডলিকের দুই চক্ষু সেই সুন্দর রাজকুমারেব দিকে চেয়ে আনন্দে ভেসে গেল।

ভীলরাজের এক ছোট ভাই ছিলেন। দশবৎসর আগে একদিন কি-জানি-কি-নিয়ে দুই ভায়ে খুব ঝগড়া হয়েছিল, সেই থেকে বিচ্ছেদ; দেখাশোনা পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। গোহ যুবরাজ হবার দিন মাণ্ডলিকের ছোট ভাই হিমালয় পর্ব্বত থেকে ভীল রাজত্বে হঠাৎ ফিরে এলেন; এসে দেখলেন, রাজপুতের ছেলে যুবরাজের আসন জুড়ে বসেছে। রাগে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল, তিনি বাজসভার মাঝে মাণ্ডলিককে ডেকে বল্লেন, —"এরে ভাইয়া, বুড়া হয়ে তুই কি পাগল হয়েচিস্! বাপের রাজ্যি ছেলেতে পাবে, তোর ছেলে হলনা, তোর পরে আমি রাজা; রাজপুতের ছেলেকে

পিঁড়ায় বসালি কি বলে ?" মাণ্ডলিক বল্লেন,—"ভাইজি ঠাণ্ডা হ"। ভাই-রাজ বল্লেন—"ঠাণ্ডা হব যেদিন তোরে আগুনে পোড়াব।" এই বলে মাণ্ডলিকের ভাইজি রাগে ফুলতে ফুলতে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মাণ্ডলিক বল্লেন,—"দূর হ, আজ হতে তুই আমার শত্রু হলি।" তারপর সোজা হয়ে সিংহাসনে বসে গোহকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে সমস্ত ভীল-সর্দ্দারদের ডেকে গোহের কপালে হাত দিয়ে শপথ করালেন, যেন সেইদিন থেকে সমস্ত ভীল-সর্দ্দার, বিপদে আপদে, সুখে দুঃখে, গোহকে রক্ষা করে;—গোহের শত্রু যেন তাদেরও শত্রু হয়। তারপর রাজসভা ভঙ্গ হল। অনেক আমোদ আহ্লাদ করে গোহ বীরনগরে ফিরে গেলেন।

সেইদিন কি ভেবে গভীর রাত্রে ভীলরাজ মাণ্ডলিক গোহের কাছে চুপি চুপি গিয়ে বল্লেন,—"গোহ, আমি তোকে ছেলের মত ভালবাসি, তোকে আমি রাজা করেছি, তোর ছুরিখানা আমায় দে, আমি নিজের হাতে তোর শত্রুকে মেরে আসব।" গোহ কোমর থেকে নিজের নাম লেখা ধারাল ছুরি খুলে দিলেন। ভীলরাজ সেই ছুরি হাতে বেরিয়ে পড়লেন। পাহাড়ের গায়ে তখন জোনাকী জলছে, ঝিঁঝি ডাকছে, দূরে দূরে দু-একটা বাঘের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে। মাণ্ডলিক সেই ছুরি হাতে রাত দুপুরে ভাই-রাজার দরজায় ঘা দিলেন;—কারো সাড়া শব্দ নাই। ভীলরাজ ধীরে ধীরে ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করলেন; দেখলেন, তাঁর ছোটভাই সামান্য ভীলের মত মাটির উপরে এক হাতে মুখ ঢেকে পড়ে আছেন। ভীলরাজের প্রাণে যেন হঠাৎ ঘা লাগল; তিনি কালো পাথরের পুতুলটির মত ছোট ভাইয়ের সুন্দর শরীর মাটির উপর পড়ে থাকতে দেখে, আর চোখের জল রাখতে পারলেন না। মনে ভাবলেন,—আমি কি নিষ্ঠুর। হায়, ছোট ভাইয়ের রাজ্য পরকে দিয়েছি, আবার কি না শত্রু ভেবে ঘুমন্ত ভাইকে মারতে এসেছি!

মাণ্ডলিক কুড়ি বৎসবের সেই ভীলরাজকুমারের মাথার শিয়রে বসে ডাকলেন,—"ভাইয়া"। একবার ডাকলেন, দুইবার ডাকলেন, তারপর মুখের কাছে থেকে তার নিটোল হাতখানি সরিয়ে নিয়ে ডাকলেন,—"ভাইয়া—"। কোনই উত্তর পেলেন না। তখন বুড়ো রাজা ছোট ভাইয়ের মুখেব কাছে মুখ রেখে তার কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুলে হাত বুলিয়ে বল্লেন,—"ভাইয়া, রাগ করেছিস্? ভাইয়া, আমার সঙ্গে কথা কইবিনে ভাইয়া? আমি তোর জন্যে হিমালয়ের আধখানা জয় করে রেখেছি, সেইখানে তোকে রাজা করব; তুই উঠে বোস্ কথা ক? ওরে ভাই কেন তুই এই দশ বছর আমায় ছেড়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালি। কেন আমার কাছে কাছে চোখে চোখে রইলিনে ভাই? আমি সাধ করে কি রাজপুতের ছেলেকে ভালবেসেছি! তুই ছেড়ে গেলে আমার যে আর কেউ ছিল না;—সে সময়ে গোহ যে আমার শূন্য ঘর আলো কবেছিল। . ভাই ওঠ, আমি তোর রাজত্ব কেড়ে নিয়েছি, আবার তোকে শত্রু বলে মারতে এসেছি; এই নে এই ছুরিখানা, আমার বুকে বসিয়ে দে, সব গোল মিটে যাক!"

মাণ্ডলিক ভাইয়ের হাতে ছুরিখানা জোর করে গুঁজে দিলেন। ধারাল ছুরি ভাই-রাজের মুঠ থেকে খসে পড়ল;—বুড়ো রাজা চম্‌কে উঠলেন! —ছোট ভাইয়ের গাটা যেন বড়ই ঠাণ্ডা বোধ হল! কান পেতে শুনলেন, নিশ্বাসের শব্দ নাই! তিনি 'ভাইয়া ভাইয়া' বলে চীৎকার করে উঠলেন।

তাঁর সমস্ত রাগ মাটির উপর মরা ভাইকে ছেড়ে রাজসিংহাসনে গোহের উপর গিয়ে পড়ল। গোহ যদি না থাকত তবে তো আজ দশ বৎসর পবে তিনি ছোট ভাইটিকে বুকে ফিরে পেতেন; তবে কি আজ ভীলরাজকুমার রাজ্য-হারা হয়ে রাগে দুঃখে বুক ফেটে মারা পড়ত? মাণ্ডলিক অনেকক্ষণ

ধরে ছোট ভাইটির বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন; কিন্তু হায় খাঁচা ফেলে পাখী যেমন উড়ে যায় তেমনি সেই ভীলবালকের সুন্দর শরীর শূন্য করে প্রাণপাখী অনেকক্ষণ উড়ে গেছে।

মাণ্ডলিক আর সে ঘরে বসে থাকতে পারলেন না, ছুরি হাতে সদর দরজা খুলে বাহিরে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল,—"গোহ রে তুই কি করলি? আমার রাজ্য নিলি, রাজসিংহাসন নিলি, ভায়ে ভায়ে বিচ্ছেদ ঘটালি, গোহ তুই কি শেষে আমার শত্রু হলি?" হঠাৎ পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে ছুটি ভীলের মেয়ে গলা ধরাধরি করে চলে গেল। একজন বলে গেল,—"আহা কি সুন্দর রাজা দেখেছিস্ ভাই! আর একজন বল্লে,—"নতুন রাজা যখন আমার হাত ধরে নাচতে লেগেছিল তখন তার মুখখানা যেন চাঁদপারা দেখলুম"। মাণ্ডলিক নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন,—হায়, এরি মধ্যে আমার প্রজারা বুড়ো রাজাটাকে ছেঁড়া কাপড়ের মত ছেড়ে ফেলেছে! ভীলরাজের মনে হল, যেন পৃথিবীতে তাঁর আব কেউ নাই। তিনি শূন্য মনে পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদখানার দিকে চেয়ে রইলেন; সেই সময় কালো ঘোড়ায় চড়ে তুইজন রাজপুত ভীলরাজের সামনে দিয়ে চলে গেল। একজন বল্লে,—"ভাই রাজ-কুমার আজ শুভ-দিনে ভীলরাজত্বের রাজসিংহাসনে না বসে সকলের সামনে যুবরাজের আসনে বসে রইলেন কেন?" অন্যজন বল্লে,—"গোহ প্রতিজ্ঞা করেছেন যতদিন বুড়ো রাজা বেঁচে থাকবেন, ততদিন তিনি যুবরাজের মত তাঁর পায়ের কাছে বসবেন।" মাণ্ডলিকের প্রাণ যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হল; তিনি হাসি মুখে মনে মনে বল্লেন,—"ধন্য গোহ, ধন্য তার ভালবাসা"। হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। মাণ্ডলিক ফিরে দেখলেন, ছোট ভাইয়ের প্রকাণ্ড শিকারী কুকুরটা নিঃশব্দে অন্ধকারে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। বুক যেন তাঁর ফেটে গেল;

তিনি 'ভাইরে' বলে পাহাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। পাথরের গায়ে লেগে গোহের সেই ছুরি, শিকারী কুকুরের দাঁতের মত, ভীলরাজের বুকে, সজোরে বিঁধে গেল;—পাহাড়ে পাহাড়ে শেয়ালের পাল চীৎকার করে উঠল, হায় হায়, হায় হায় হায়, হায় হায় হায়।

পরদিন সকালে একজন রাজপুত পাহাড়ের পথে বীরনগরে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখতে পেলেন,—ভীলরাজের রক্তমাখা দেহ, বুকে মহারাজ গোহের ছুরি বেঁধা। রাজপুত সেই ছুরি হাতে গোহের কাছে এসে বল্লেন,—"মহারাজ করেছ কি? আশ্রয়দাতা চিরবিশ্বাসী ভীলরাজকে খুন করেছ?" গোহ তৎক্ষণাৎ সেই রাজপুতের মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিলেন। তারপর সেই রক্তমাখা ছুরি কোমরে গুঁজে, দুই হাতে চক্ষের জল মুছে, ভাই-রাজার সঙ্গে প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাণ্ডলিককে চিতার আগুনে তুলে দিয়ে, সূর্য্যবংশের রাজপুত্র গোহ ভীলরাজের রাজসিংহাসনে বসে রাজত্ব করতে লাগলেন।

বাপ্পাদিত্য

তুঁষের আগুন যেমন প্রথমে ধিকি ধিকি শেষে হঠাৎ ধূ ধূ করে জলে ওঠে, তেমনি গোহের পর থেকে রাজপুতদেব উপর ভীলদের রাগ ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে, বাড়তে বাড়তে একদিন দাউ দাউ কবে পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে দাবানলের মত জলে উঠল।

গোহের সুন্দর মুখ, অসীম দয়া, অটল সাহসেব কথা মনে রেখে ভীলেরা আট-পুরুষ পর্য্যন্ত রাজপুত রাজাদেব সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিল। যদি কোন রাজপুত রাজা শিকারে যেতে পথের ধারে কোন ভীলের কালো গায়ে বল্লমের খোঁচায় রক্তপাত করে চলে যেতেন, তবে তার মনে পড়ত,—রাজা গোহ একদিন তাদেরই বংশের একজনকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনে নিজের হাতে তার বুকের রক্ত মুছে দিয়েছিলেন। যখন কোন রাজকুমার, কোন একদিন সখ্ করে গ্রামকে গ্রাম জালিয়ে দিয়ে তামাসা দেখতেন, তখন তাদের মনে পড়ত,—এক বছর দুর্ভিক্ষের দিনে রাজা গোহ তাঁর প্রকাণ্ড রাজবাড়ি, পরিপূর্ণ ধানের গোলা, আশ্রয়হীন দীনদুঃখী ভীল প্রজাদের জন্যে সারা বৎসর খুলে রেখে-ছিলেন! ভাগ্যদোষে যুদ্ধে জয় না হলে যেদিন কোন কাপুরুষ যুবরাজ বিশ্বাস-ঘাতক বলে ভীল সেনাপতিদের মাথা একটির পর একটি হাতীর পায়ের তলায় চূর্ণ করে ফেলতেন, সেদিন সমস্ত ভীল-বাহিনী চক্ষেব জল মুছে ভাবত,—হায়রে হায়, মহারাজ গোহ ছিলেন, যিনি যুদ্ধের সময় ভায়ের মত তাদের যত্ন করতেন, মায়ের মত তাদের রক্ষা করতেন, বীরের মত সকলের আগে চলতেন!

এত অত্যাচার, এত অপমান, তবু সেই বিশ্বাসী ভীল প্রজাদের সরল

প্রাণ আট-পুরুষ পর্য্যন্ত বিশ্বাসে রাজভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু যখন বাপ্পাদিত্যের পিতা নাগাদিত্য রাজসিংহাসনে বসে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করলেন; যখন গরীব প্রজাদের গ্রাম জালিয়ে ক্ষেত উজাড় করে তাঁর মন সন্তুষ্ট হলনা; তিনি যখন হাজার হাজার ভীলের মেয়ে দাসীর মত রাজ-পুতের ঘরে ঘরে বিলিয়ে দিতে লাগলেন; যখন প্রতিদিন নূতন নূতন অত্যাচার না হলে রাত্রে তাঁর ঘুম হতনা; শেষে সমস্ত ভীলের প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাদের একমাত্র আমোদ—বনে বনে পশু শিকার—যে দিন নাগাদিত্য নূতন আইন করে একবারে বন্ধ করলেন; সেদিন তাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল।

নাগাদিত্য ভীল প্রজাদের উপর এই নূতন আইন জারি করে সমস্ত রাত্রি সুখের স্বপ্নে কাটিয়ে সকালে উঠে দেখলেন, দিনটা বেশ মেঘলা-মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে, কোন দিকে ধুলো নেই, শিকারের বেশ সুবিধা! নাগাদিত্য তৎক্ষণাৎ হাতী সাজিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সেদিন রাজার সঙ্গে কেবল রাজপুত!—দলের পর দল বড় বড় ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত! সামান্য ভীলের একটি ছোট ছেলে পর্য্যন্ত যাবার হুকুম নাই! শিকার দেখলে খাঁচার ভিতর চিতা বাঘ যেমন ছট্‌ফট্ করে, আজ এমন শিকারের দিনে ঘরের ভিতর বসে থেকে ভীলদের প্রাণ তেমনিই ছট্ ফট্ করছে। এই কথা ভেবে নিষ্ঠুর নাগাদিত্যের মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

মহারাজ নাগাদিত্য দল বল নিয়ে ভেরী বাজিয়ে হৈ হৈ শব্দে পর্ব্বতের শিখরে চড়লেন;—বজ্রের মত ভয়ঙ্কর সেই ভেরীর আওয়াজ শুনে অন্যদিন মহিষের পাল জল ছেড়ে উঠে পালাত, বনের পাখী বাসা ছেড়ে আকাশে উঠত, হাজার হাজার হরিণ প্রাণভয়ে পথ ভুলে ছুটতে ছুটতে যেখানে শিকারী সেইখানেই এসে উপস্থিত হত, ঘুমন্ত সিংহ জেগে উঠত, বাঘ হাঁকার

আহত নাগাদিত্য

দিত,—শিকারীরা কেউ বল্লম হাতে মহিষের পিছনে, কেউ খাঁড়া হাতে সিংহের সন্ধানে ছুটে চলত; কিন্তু নাগাদিত্য আজ বার বার ভেরী বাজালেন, বারবার শিকারীর দল চীৎকার করে উঠল, তবু সেই প্রকাণ্ড বনে একটিও বাঘের গর্জ্জন, একটিও পাখীর ঝটাপট্ কিম্বা হরিণের খুরের খুট্ খাট্ শোনা গেল না।—মনে হল সমস্ত পাহাড় যেন ঘুমিয়ে আছে! রাগে নাগাদিত্যের দুই চক্ষু লাল হয়ে উঠল। তিনি দলবলের দিকে ফিরে বল্লেন,—"ঘোড়া ফেরাও। অসন্তুষ্ট ভীল প্রজা এ বনের সমস্ত পশু অন্য পাহাড়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। চল আজ গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে পশুর সমান ভীলের দল শিকার করিগে।"

মহারাজার রাজহস্তী শুঁড় দুলিয়ে কান কাঁপিয়ে পাহাড়ের উপর ইদর-পুরের দিকে ফিরে দাঁড়াল;—তার পিঠের উপর সোনার হাওদা, জরীর বিছানা হীরের মত জ্বলে উঠল; তার চারিদিকে ঘোড়ায় চড়া রাজপুতের ছুশো বল্লম সকালের আলোয় ঝক্‌মক্ করতে লাগল। নাগাদিত্য হুকুম দিলেন "চালাও!" তখন কোথা থেকে গভীর গর্জ্জনে, সমস্ত পাহাড় যেন ফাটিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কালো বাঘ যেন একজন ভীল সেনাপতির মত, সেই অত্যাচারী রাজার পথ আগ্‌লে পাহাড়ের শুঁড়ি পথে রাজহস্তীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। নাগাদিত্য মহা আনন্দে ডান হাতে বল্লম নিয়ে হাতীর পিঠে ঝুঁকে বসলেন। কিন্তু তাঁর হাতের বল্লম হাতেই রইল;—বনের অন্ধকার থেকে কালো চামরে সাজান প্রকাণ্ড একটা তীর তাঁর বুকের একদিক থেকে আর একদিক ফাটিয়ে দিয়ে শন্ শন্ শব্দে বেরিয়ে গেল;—অত্যাচারী নাগাদিত্য ভীলদের হাতে প্রাণ হারালেন। তারপর চারিদিক থেকে হাজার হাজার কালো বাঘের মত কালো কালো ভীল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাজপুতের রক্তে পাহাড়ের গা রাঙা করে তুল্লে। একজনও রাজপুত বেঁচে রইল না;—কেবল সোনার সাজ পরা মহারাজ

নাগাদিত্যের কালো একটা পাহাড়ী ঘোড়া অন্ধকার সমুদ্রের সমান ভীল সৈন্যের মাঝ দিয়ে ঝড়ের মত রাজবাড়ীর দিকে বেরিয়ে গেল।

রাজমহিষী তখন ইদরপুরে কেল্লার ছাতে রাজকুমার বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সন্ধ্যার হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আর এক একবার যে পাহাড়ে মহারাজ শিকারে গিয়েছেন সেই দিকে চেয়ে দেখছিলেন। এক সময়ে হঠাৎ পাহাড়ের দিকে একটি গোলমাল উঠল ; তারপর রাণী দেখলেন, সেই পাহাড়ে রাস্তায়, বনের অন্ধকার থেকে, মহারাজার কালো ঘোড়াটি তীরের মত ছুটে বেরিয়ে, ঝড়ের মত কেল্লার দিকে ছুটে আসতে লাগল ;—পিছনে তার শত শত ভীল,—কারো হাতে বল্লম, কারো হাতে বা তীরধনুক ! মহারাণী দেখলেন, কালো ঘোড়ার মুখ থেকে সাদা ফেণা চারিদিকে মুক্তোর মত ঝরে পড়ছে, তার বুকের মাঝ থেকে রক্তের ধারা রাস্তার ধূলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে ; তারপর দেখলেন আগুনের মত একটা তীর তার কালো-চুলের ভিতর দিয়ে ধনুকের মত তার সুন্দর বাঁকা ঘাড় সজোরে বিঁধে ঘোড়াটাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেল্লে ; রাজার ঘোড়া কেল্লার দিকে মুখ ফিরিয়ে ধূলার উপর ধড়ফড় করতে লাগল। ঠিক সেই সময় মহারাণীর মাথার উপর দিয়ে একটা বল্লম শন্ শন্ শব্দে কেল্লার ছাতের উপর এসে পড়ল। রাজমহিষী ঘুমন্ত বাপ্পাকে ওড়নার আড়ালে ঢেকে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এলেন। চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনি আর যুদ্ধের চীৎকার উঠল ;—সূর্য্যদেব মালিয়া পাহাড়ের পশ্চিম পারে অস্ত গেলেন।

সে রাত্রি কি ভয়ানক রাত্রি! সেই মালিয়া পাহাড়ের উপর অসংখ্য ভীল, তার মাঝে গুটিকতক রাজপুত্র প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন ; আর অন্ধকার রাজপুরে নাগাদিত্যের বিধবা মহিষী পাঁচ বৎসরের রাজকুমার বাপ্পাকে বুকে নিয়ে নির্জ্জন ঘরে বসে রইলেন। তিনি কত বার কত দাসীর নাম ধরে ডাকলেন,—কারো সাড়া শব্দ নাই। মহারাজের খবর জানবার

জন্য তিনি কতবার কত প্রহরীকে চীৎকার করে ডাকলেন, কিন্তু তারা সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত,—মহারাণীর ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল তবু তাঁর কথায় কর্ণপাতও করলে না। রাণী তখন আকুল হৃদয়ে কোলের বাপ্পাকে ছোট একখানি উটের কম্বলে ঢেকে নিয়ে অন্দর মহলের চন্দন কাঠের প্রকাণ্ড দরজা সোনার চাবি দিয়ে খুলে বাইরে উঁকি মেরে দেখলেন;—রাত্রি অন্ধকার, রাজপুরী অন্ধকার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের খিলান তার মাঝে গজদন্তের কাজ-করা বড় বড় দরজা খোলা, হাঁ হাঁ করছে;—অত বড় রাজপুরীতে যেন জনমানব নাই।

মহারাণী অবাক হয়ে এক হাতে বাপ্পাকে বুকে ধরে আর হাতে সোনার চাবির গোছা নিয়ে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল;—চামড়ার জুতোপরা রাজপুত বীরের মচ্ মচ্ পায়ের শব্দ নয়; রূপার বাঁকি পরা রাজদাসীর ঝিনি ঝিনি পায়ের শব্দ নয়; কাঠের খড়ম পরা পঁচাশি বৎসরের বুড়ো রাজপুরোহিতের খটাখট্ পায়ের শব্দ নয়;—এ যেন চোরের মত, সাপের মত খুস্ খাস্ খিট্ খাট্ পায়ের শব্দ। মহারাণী ভয় পেলেন। দেখতে দেখতে অসুরের মত একজন ভীল সর্দার তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল। মহারাণী জিজ্ঞাসা করলেন,—"কে তুই? কি চাস?" ভীল সর্দার বাঘের মত গর্জ্জন করে বল্লে,—"জানিসনে আমি কে? আমি সেই দুঃখী ভীল, যার মেয়েকে তোর মহারাজা দাসীর মত চিতোরের রাজাকে দিয়ে দিয়েছে। আজ কি সুখের দিন!—এই হাতে নাগাদিত্যের বুকে বল্লম বসিয়েচি, আজ এই হাতে তার ছেলে সুদ্ধ মহারাণীকে দাসীর মত বেঁধে নিয়ে যাব।"

মহারাণীর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। 'ভগবান রক্ষা কর' বলে তিনি সেই নিরেট সোনার বড় বড় চাবির গোছা সজোরে ভীল সর্দারের কপালে ছুঁড়ে মারলেন। দুরন্ত ভীল "মা রে" বলে চীৎকার করে

ঘুরে পড়ল; মহারাণী কচি বাপ্পাকে বুকে ধরে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন;—তাঁর প্রাণের আধখানা মহারাজ নাগাদিত্যের জন্য হাহাকার করতে লাগল, আর আধখানা এই মহাবিপদে প্রাণের বাপ্পাকে রক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

রাণী পথ চল্‌তে লাগলেন;—পাথরে পা কেটে গেল, শীতে হাত জমে গেল, অন্ধকারে বার বার পথ ভুল হতে লাগল, তবু রাণী পথ চল্লেন। কত দূর! কত দূর!—পাহাড়ের পথ কত দূর কোথায় চলে গেছে, তার যেন শেষ নাই! রাণী কত পথ চল্লেন তবু সে পথের শেষ নাই! ক্রমে ভোর হয়ে গেল, রাস্তার আশে পাশে বীরনগরের দু একটি ব্রাহ্মণের বাড়ি দেখা দিতে লাগল। পাহাড়ী হাওয়া বরফের মত ঠাণ্ডা; পাখীরাও তখন জাগেনি এমন সময় নাগাদিত্যের মহিষী রাজপুত্র বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সেই বীরনগরের ব্রাহ্মণী কমলাবতীর বাড়ির দরজায় ঘা দিলেন। আটপুরুষ আগে, এক দিন শিলাদিত্যের মহিষী পুষ্পবতী প্রাণের কুমার গোহকে এই বীরনগরের কমলাবতীর হাতে সঁপে গিয়েছিলেন; আর আজ আবার কত কাল পরে সেই কমলাবতীর নাতির নাতি বৃদ্ধ রাজপুরোহিতের হাতে গোহর বংশের গিহ্লোট রাজকুমার বাপ্পাকে সঁপে দিয়ে, নাগাদিত্যের মহিষী চিতার আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

সকালে বৃদ্ধ পুরোহিত রাজপুত্রকে আশ্রয় দিলেন, আর সেইদিন সন্ধ্যার সময় একটি ভীলের মেয়ে ছোট ছোট দুটি ছেলে কোলে তাঁরই ঘরে আশ্রয় নিলে। এদেরই পূর্ব্বপুরুষ সব প্রথমে নিজের আঙুল কেটে রাজপুত গোহের কপালে রক্তের রাজতিলক টেনে দিয়েছিল—আজ রাজপুত রাজার সঙ্গে তাদেরও সর্ব্বনাশ হয়ে গেল;—বিদ্রোহী ভীলেরা তাদেরও ঘর দুয়োর জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের তিনটিকে পাহাড়ের উপর থেকে দূর করে দিলে। রাজপুরোহিত সেই তিনটি ভীল আর রাজকুমার বাপ্পাকে

নিয়ে বীরনগর ছেড়ে ভাণ্ডীরের কেল্লায় যদুবংশের আর এক ভীলের রাজত্বে কিছু দিন কাটালেন। কিন্তু সেখানেও ভীল রাজা, সেখানেও ভয় ছিল— কোন্ দিন কোন্ ভীল মা-হারা বাপ্পাকে খুন্ করে। ব্রাহ্মণ যে মহারাণীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন বিপদে সম্পদে অনাথ বাপ্পাকে রক্ষা করবেন। তিনি একেবারে ভীলরাজত্ব ছেড়ে তাদের ক'টিকে নিয়ে নগেন্দ্রনগরে চলে গেলেন। একদিকে সমুদ্রের তিনটে ঢেউয়ের মত ত্রিকূট পাহাড়, আর একদিকে মেঘের মত অন্ধকার পরাশর অরণ্য, মাঝখানে নগেন্দ্রনগর, কাছাকাছি শোলাঙ্কি বংশের একজন রাজপুত রাজার রাজবাড়ি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই নগেন্দ্রনগরে ব্রাহ্মণ-পাড়ার গা ঘেঁসে ঘর বাঁধলেন। সেই ভীলের মেয়ে তাঁর ঘরের সমস্ত কাজ করতে লাগল আর রাজপুত্র বাপ্পা সেই দুটি ভাই, ভীল বালিয় আর দেবকে নিয়ে মাঠে মাঠে বনে বনে গরু চরিয়ে রাখাল বালকদের সঙ্গে রাখালের মত খেলে বেড়াতে লাগলেন। রাজপুরোহিত কারো কাছে প্রকাশ করলেন না যে, বাপ্পা রাজার ছেলে ; কেবল একটি তামার কবচে আগাগোড়া সমস্ত পরিচয় নিজের হাতে লিখে বাপ্পার গলায় বেঁধে দিলেন ;—তাঁর মনে বড় ভয় ছিল পাছে কোন ভীল বাপ্পার সন্ধান পায়।

ক্রমে বাপ্পা যখন বড় হয়ে উঠলেন ; যখন মাঠে মাঠে খোলা হাওয়ায় ছুটোছুটি করে, পাহাড়ে পাহাড়ে ওঠানামাতে রাজপুত্র বাপ্পার সুন্দর শরীর দিন দিন লোহার মত শক্ত হয়ে উঠল ; যখন তিনি ক্ষেপা মোষ এক হাতে ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন ; সমস্ত রাখালবালক যখন রাজপুত্র বলে না জেনেও রাজার মত বাপ্পাকে ভয়, ভক্তি, সেবা করতে লাগল ; তখন ব্রাহ্মণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন, তিনি তখন বাপ্পার শরীরের সঙ্গে মনকেও গড়ে তুলতে লাগলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একলা ঘরে বাপ্পার কাছে বসে সেই মালিয়া পাহাড়ের গল্প, সেই ভীল বিদ্রোহের

গল্প, সেই রাণী পুষ্পবতী, মহারাজ শীলাদিত্য, রাজকুমার গোহ, তাঁর প্রিয় বন্ধু মাণ্ডলিকের কথা একে একে বলতে লাগলেন। শুনতে শুনতে কখন বাপ্পার চোখে জল আসত, কখন বা রাগে মুখ লাল হয়ে উঠত, কখন ভয়ে প্রাণ কাঁপত। বাপ্পা সারা রাত্রি কখন সূর্য্যের রথ, কখন পাহাড়ে ভীলের যুদ্ধ স্বপ্নে দেখে জেগে উঠতেন; মনে ভাবতেন,—আমিও কবে হয়তো রাজা হব, লড়াই করব।

এমনি ভাবে দিন কাটছিল। সেই সময় একদিন শ্রাবণ মাসে নতুন নতুন ঘাসের উপর গোরু গুলিকে চরতে দিয়ে বনের পথে বাপ্পাদিত্য একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেদিন ঝুলন পর্ব্ব, রাজপুতদের বড় আনন্দের দিন; সকাল না হতে দলে দলে রাখাল নতুন কাপড় পোরে, কেউ ছোট ভাইবোনকে কোলে করে, কেউ বা দৈয়ের ভার কাঁধে নিয়ে, একজন তামাসা দেখতে, অন্য জন বা পয়সা করতে নগেন্দ্রনগরের রাজপুত রাজার বাড়ির দিকে মেলা দেখতে ছুটল। বাপ্পা প্রকাণ্ড বনে একলা রইলেন; তাঁর প্রাণের বন্ধু দুটি, ভাই ভীল বালিয় আর দেব, দিদির হাত ধরে এই আনন্দের দিনে বাপ্পাকে কতবার ডাকলে,—"ভাই তুই কি রাজবাড়ি যাবি?" বাপ্পা শুধু ঘাড় নড়লেন,—"না যাবনা।" হয়ত তাঁর মনে হয়েছিল,—আমার ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই, আমি কার হাত ধরে কাকে নিয়ে আজ কিসের আনন্দের মেলা দেখতে যাব? কিন্তু যখন বালিয় আর দেব, ভীলনী দিদির সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে চলে গেল; যখন সকালের রোদ মেঘের আড়ালে ঢেকে গেল; বাপ্পার একটি মাত্র গাই চরতে চরতে যখন মাঠের পর মাঠ পার হয়ে বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল; যখন বনে আর সাড়া শব্দ নেই, কেবল মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁর ঝিনি ঝিনি পাতার ঝুরু ঝুরু, সেই সময় বাপ্পার বড়ই একা-একা ঠেকতে

লাগল। তিনি উদাস প্রাণে ভীলনী দিদির মুখে শোনা ভীল রাজত্বের একটি পাহাড়ী গান ছোট একটি বাঁশের বাঁশীতে বাজাতে লাগলেন। সে গানের কথা বোঝা গেলনা কেবল ঘুমপাড়ানি গানের মত তার বুনো সুরটা মেঘলা দিনে বাদলার হাওয়ায় মিশে স্বপ্নের মত বাপ্পার চারিদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল। আজ যেন তাঁর মনে পড়তে লাগল,—ঐ পশ্চিম দিকে যেখানে মেঘের কোলে সূর্য্যের আলো ঝিকি মিকি জ্বলছে, যেখানে কালো কালো মেঘ পাথরের মত জমাট বেঁধে রয়েছে, সেইখানে, সেই অন্ধকার আকাশের নীচে, তাঁদের যেন বাড়ি ছিল ; সেই বাড়ির ছাতে চাঁদের আলোয় তিনি মায়ের হাত ধরে বেড়িয়ে বেড়াতেন ; সে বাড়ি কি সুন্দর ! সে চাঁদের কি চমৎকার আলো ! মায়ের কেমন হাসি মুখ! সেখানে সবুজ ঘাসে হরিণ-ছানা চরে বেড়াত ; গাছের উপর টিয়ে পাখী উড়ে বসত ; পাহাড়ের গায়ে ফুলের গোছা ফুটে থাকত ; —তাদের কি সুন্দর রং, কি সুন্দর খেলা! বাপ্পা সজল নয়নে মেঘের দিকে চেয়ে চেয়ে বাঁশের বাঁশীতে ভীলের গান বাজাতে লাগলেন ; —বাঁশীর করুণ সুর কেঁদে কেঁদে কেঁপে কেঁপে বন থেকে বনে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সেই বনের একধারে আজ ঝুলন পূর্ণিমায়, আনন্দের দিনে, শোলাঙ্কি-বংশের রাজার মেয়ে সখীদের নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছিলেন। রাজকুমারী বল্লেন—"শুনেছিস্ ভাই, বনের ভিতর রাখাল রাজা বাঁশী বাজাচ্ছে!" সখীরা বল্লে,—"আয় ভাই, সকলে মিলে চাঁপাগাছে দোলা খাটিয়ে ঝুলনো খেলা খেলি আয়!" কিন্তু দোলা খাটাবার দড়ি নাই যে! সেই বৃন্দাবনের মত গহন বন, সেই বাদলা দিনের গুরু গর্জ্জন, সেই দূর বনে রাখালরাজের মধুর বাঁশী, সেই সখীদের মাঝে শ্রীরাধার সমান রূপবতী রাজনন্দিনী, সবি আজ যুগযুগান্তর আগেকার বৃন্দাবনে কৃষ্ণ

রাধার প্রথম ঝুলনের মত! এমন দিন কি ঝুলনা বাঁধার একগাছি দড়ির অভাবে বৃথা যাবে? রাজনন্দিনী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন! আবার সেই বাঁশী পাখীর গানেব মত বনের এ পার থেকে ওপার আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বেজে উঠল! রাজকুমারী তথন হীরে জড়ান হাতের বালা সখীর হাতে দিয়ে বল্লেন,—"যা ভাই, এই বালার বদলে ঐ রাখালের কাছ থেকে এক গাছা দড়ি নিয়ে আয়।"

রাজকুমারীর সখি সেই বালা হাতে বাপ্পার কাছে এসে বল্লে,—"এই বালার বদলে রাজকুমারীকে একগাছা দড়ি দিতে পার?" হাসতে হাসতে বাপ্পা বল্লেন,—"পারি, যদি রাজকুমারী আমায় বিয়ে করেন।"

সেইদিন সেই নির্জ্জন বনে, রাজকুমারীর হাতে সেই হীবের বালা পরিয়ে দিয়ে রাজকুমার বাপ্পা চাঁপাগাছে ঝুলনা বেঁধে দিয়ে রাজকন্যার হাত ধরে বসলেন। চারিদিকে যত সখী দোলার উপর বরকোনেকে ঘিরে ঘিরে ঝুলনের গান গেয়ে ফিরতে লাগল;—'আজ কি আনন্দ, আজ কি আনন্দ!'

খেলা শেষ হল, সন্ধ্যা হল; রাজকুমারী বনের রাখালকে বিয়ে করে রাজবাড়ীতে ফিরে গেলেন। আর বাপ্পা ফুলে ফুলে প্রফুল্ল চাঁপার তলায় বসে ঝুলন পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন,—আজ কি আনন্দ, আজ কি আনন্দ!

হঠাৎ একটুখানি পূবেব হাওয়া গাছের পাতা কাঁপিয়ে, ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে, হু হু শব্দে পশ্চিমদিকে চলে গেল; সেই সঙ্গে বড় বড় দুটি বৃষ্টির ফোঁটা টুপ্ টাপ্ করে চাঁপা গাছের সবুজ পাতার উপরে ঝরে পড়ল। বাপ্পা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন—পশ্চিমদিক থেকে একখানা কালো মেঘ ক্রমশ পূবদিকে এগিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে গুরু গুরু গর্জ্জন আর ঝিকিমিকি বিদ্যুৎ হানছে! বাপ্পা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন;

মনে পড়ল, ঘরে ফিরতে হবে। দুধের মত সাদা তাঁর ধবলী গাই বনের মাঝে ছাড়া আছে, তিনি চাঁপাগাছ থেকে ছাঁদন দড়ি খুলে নিয়ে ধবলী গাইটির সন্ধানে চল্লেন। তখন চারিদিকে অন্ধকার, মাঝে মাঝে গাছে গাছে রাশি রাশি জোনাকী পোকা হীরের মত ঝক্ ঝক্ করছে, আর জায়গায় জায়গায় ভিজে মাটির নরম গন্ধ বনস্থল পরিপূর্ণ করেছে। বাপ্পা সেই অন্ধকার বনের পথে পথে ধবলীর সন্ধানে ফিরতে লাগলেন। হঠাৎ এক জায়গায়, ঘন বেত বনের আড়ালে, বাপ্পা দেখলেন, —এক তেজোময় ঋষি ধ্যানে বসে আছেন ; ঠিক তাঁর সম্মুখে মহাদেবের নন্দের মত তাঁর ধবলী গাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই সাদা গাইয়ের গাঢ় দুধ সুধার মত একটি শ্বেত পাথরের শিবের মাথায় আপনা আপনি ঝরে পড়ছে। বাপ্পা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ক্রমে ধ্যানভঙ্গে মহর্ষির দুটি চোখ সকাল বেলায় পদ্মের পাপড়ির মত ধীরে ধীরে খুলে গেল। মহর্ষি মহাদেবকে প্রণাম করে এক অঞ্জলি দুধের ধারা পান করলেন। তার পর বাপ্পার দিকে ফিরে বল্লেন,—"শোনো বৎস, আমি মহর্ষি হারীত। তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি দীর্ঘজীবী হও, পৃথিবীর রাজা হও। তোমার ধবলীর দুধের ধারায় আজ আমি বড়ই তুষ্ট হয়েছি। আজ আমার মহাপ্রস্থানের দিন, এই শেষ দিনে তোমায় আর কি দেব? এই ভগবতী ভবানীর খাঁড়া,—এই অক্ষয় ধনুঃশর,—এই খাঁড়া পাহাড়ও বিদীর্ণ করে, এই ধনুঃশর পৃথিবী জয় করে দেয়,—এই দুটি তুমি লও। আর, বৎস, ভগবান একলিঙ্গের এই শ্বেত পাথরের মূর্ত্তিটি তুমি সঙ্গে রেখ, সর্ব্বদা এঁর পূজা করবে। আজ হতে তোমার নাম হল—একলিঙ্গকা দেওয়ান। তোমার বংশে যত রাজা, এই নাম নিয়েই সিংহাসনে বসবে।" তারপর নিজের হাতে বাপ্পার গলায় চামড়ার পৈতা

জড়িয়ে দিয়ে মহর্ষি সমাধিতে বসলেন। দেখতে দেখতে তাঁর পবিত্র শরীর আগুনের মত ধূ ধূ করে জ্বলে গেল। বাপ্পা, কোমরে খাঁড়া, হাতে ধনুঃশর, মাথায় একলিঙ্গের পাথরের মূর্ত্তি ধরে ধবলী গাইয়ের পিছনে পিছনে ফিরে চল্লেন ;—মেঘের গুরু গুরু, দেবতার দুন্দুভির মত, সমস্ত আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল।

তখন ভোর হয়েছে, মেলা শেষে মলিন মুখে যে যার ঘরে ফিরছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদের সঙ্গে ঘরে ফিরলেন।

কিছুদিন পরেই বাপ্পাকে নগেন্দ্রনগর ছেড়ে যেতে হল। ঝুলন পূর্ণিমার খেলাচ্ছলে দুজনে বিয়ে হবার পর বিদেশ থেকে রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হলেন ; সেইদিন সন্ধ্যাবেলা নগেন্দ্রনগরে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, ব্রাহ্মণ, রাজকন্যার হাত দেখে শুনে বলেছেন, আগেই নাকি কোন বিদেশীর সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হয়ে গেছে ; আজ রাজার গুপ্তচর সেই বিদেশীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ;—রাজা তার মাথা আনতে হুকুম দিয়েছেন। কথাটা শুনে বাপ্পার মন অস্থির হয়ে উঠল, ভাবনায় ভাবনায় সমস্ত রাত কাটিয়ে ভোরে উঠে তিনি দেশ ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাবার সময় বাপ্পা তাঁর পালক-পিতা পঁচাশী বৎসরের সেই রাজপুরোহিতের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বল্লেন,—"পিতা, আমায় বিদায় দাও। আমি তো এখন বড় হয়েছি ; আমার জন্য তোমরা কেন বিপদে পড় ?" ব্রাহ্মণ বল্লেন,—"বৎস, তুমি জাননা তুমি কে ; তুমি রাজপুত্র ; তোমার মা তোমাকে আমার হাতে সঁপে গেছেন ; আমি আজ এই অল্প বয়সে একা ভিখারীর মত তোমাকে কেমন করে বিদায় করব ?" বাপ্পা তখন ভগবতীর সেই খাঁড়া আর অক্ষয় ধনুঃশর দেখিয়ে বল্লেন,—"পিতা, বিদেশে এরাই আমার সহায়, আর আছেন একলিঙ্গজী।" ব্রাহ্মণ তখন মহা

আনন্দে দুই হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কল্লেন,—"যাও বৎস, তুমি রাজার ছেলে রাজারই মত ধনুঃশর হাতে পেয়েছ। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করছি পৃথিবীর রাজা হও, যদি কেউ তোমার পরিচয় চায় তবে গলার কবচ খুলে দেখিয়ে দিও কোন্ পবিত্র বংশে তোমার জন্ম, তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্ রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করে গেছেন। যাও বৎস সুখে থাক।"

ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় হয়ে বাপ্পা ভীলনী দিদির কাছে বিদায় হতে চল্লেন, কিন্তু সেখানে বিদায় নেওয়া ততটা সহজ হলনা। অনেক কাঁদা কাটার পর ভীলনী দিদি বল্লেন,—"বাপ্পারে যদি যাবি তবে তোর দুটি ভাই, বালিয় দেবকে সাথে নে। ওরে বাপ্পা, তোকে একা ছেড়ে দিতে প্রাণ আমার কেমন কেমন করে যে!" তারপর তিন জনের হাতে তিন তিন খানি পোড়া রুটি দিয়ে ভীলনী দিদি তিনটি ভাইকে বিদায় কল্লেন। বাপ্পা বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে গহন বনে চলে গেলেন। সেখানে বড় বড় পাথরের থামের মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, কোথাও ময়ূর ময়ূরী বন আলো করে উড়ে বেড়াচ্ছে, কোথাও আস্ত ছাগল গিলে প্রকাণ্ড একটা অজগর স্থির হয়ে পড়ে, কোথাও বাঘের গর্জ্জন, কোথাও বা পাখীর গান; এক জায়গায় সবুজ ঘাসে সোনার রোদ, আর জায়গায় কাজলের সমান নীল অন্ধকার। বাপ্পা বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে কখন বনের মনোহর শোভা দেখতে দেখতে কখন মহা মহা বিপদের মাঝখান দিয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া হাতে নির্ভয়ে চল্লেন।

সেই প্রকাণ্ড পরাশর অরণ্য পার হতে তাঁর তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল। রাজপুত্র বাপ্পা সেই তিন দিন তিন খানি পোড়া রুটি খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। তারপর গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ পার

হয়ে, কত বর্ষা, কত শীত পথে পথে কাটিয়ে, বাপ্পা মেবারে মৌর্য্য-বংশীয় রাজা মানের রাজধানী চিতোর নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের মহা আয়োজন হচ্ছে। হাতীর পিঠে, উটের উপরে গোলাগুলি, চালডাল তাম্বুকানাত, গোরুর গাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র, খাবারদাবার, বড় বড় জালায় খাবার জল, রাঁধবার ঘি তোলা হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় রাজপুত সৈন্য মাথায়-পাগড়ি হাতে-বল্লম ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে রাজার চর মুসলমানের সন্ধানে সন্ধানে ফিরছে। মহারাজা মান নিজে সামন্ত রাজাদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন দেখে বেড়াচ্ছেন,—চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেছে।

এত গোলমাল, এত লোকজন, এমন প্রকাণ্ড নগর, এত বড় বড় পাথরের বাড়ি বাপ্পা এ পর্য্যন্ত কখন দেখেন নি। নগেন্দ্রনগরে বাড়ি ছিল বটে কিন্তু তার মাটির দেওয়াল। সেখানেও মন্দির ছিল কিন্তু সে কত ছোট। বাপ্পা আশ্চর্য্য হয়ে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, বালিয় আর দেব বড় বড় হাতী দেখে অবাক হয়ে হাঁ করে রইল। সেই সময় রাজা মান ঘোড়ায় চড়ে সেই রাস্তায় উপস্থিত হলেন;—সাদা ঘোড়ার সোনার সাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, মাথায় রাজছত্র ঝল্‌মল্ করছে, দুইদিকে দুইজন ময়ুর-পাখার চামর ঢোলাচ্ছে। বাপ্পা ভাবলেন,—রাজার সঙ্গে দেখা করবার এই ঠিক সময়। তিনি তৎক্ষণাৎ বালিয় ও দেবের হাত ধরে রাস্তার মাঝে উপস্থিত হয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া কপালে স্পর্শ করে মহারাজকে প্রণাম করলেন। রাজা মান জিজ্ঞাসা করলেন,—"কে তুমি? কি চাও?" বাপ্পা বল্লেন,—"আমি রাজপুত রাজার ছেলে আপনার আশ্রয়ে রাজার মত থাকতে চাই।" এই ভিখারী আবার রাজার ছেলে! চারিদিকে বড় বড় সর্দ্দার মুখ টিপে হাসতে লাগলেন, কিন্তু রাজা মান বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সুন্দর মুখ, অক্ষয় ধনুঃশর আর সেই ভবানীর খাঁড়া দেখেই

বুঝেছিলেন—এ কোন ভাগ্যবান, ভগবান কৃপা করে এই মুসলমান-যুদ্ধের সময় এই বীর পুরুষকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। মানরাজা তৎক্ষণাৎ নিজের জরীর শাল বাপ্পার গায়ে পরিয়ে দিয়ে একটা কালো ঘোড়া বাপ্পার জন্যে আনিয়ে দিলেন। বাপ্পা বল্লেন,—"মহারাজ, আমার ভীল ভাইদের জন্যে ঘোড়া আনিয়ে দিন্।" তারপর, বালিয় ও দেবকে ঘোড়ায় চড়িয়ে বাপ্পা সেই কালো ঘোড়ায় উঠে বসলেন ;—সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও সেনাপতির মাথার উপর বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সমুদ্রের মাঝে পাহাড়ের মত, প্রায় আধখানা জেগে রইল ; তখন রাস্তার লোক দেখে বলতে লাগল—হাঁ বীর বটে ! যেমন চেহারা তেমনি শরীর ! চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল ; কেবল রাজার যত সেনাপতি মাথার উপরে রাজবেশমোড়া সেই ভিখারীকে দেখে মান রাজার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন। রাজা দিন দিন বাপ্পাকে যতই সুনয়নে দেখতে লাগলেন, যতই তাকে আদর অভ্যর্থনা করতে লাগলেন, ততই সেনাপতিদের মন হিংসার আগুনে পুড়তে লাগল।

ক্রমে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের দিন উপস্থিত হল। সেইদিন রাজসভায় দেশ বিদেশের যত সামন্ত রাজা, যত বুড়ো বুড়ো সেনাপতি একমত হয়ে মান রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বল্লেন,—"মহারাজ! আমরা অনেক সময় অনেক যুদ্ধে তোমার জন্যে প্রাণ দিতে গিয়েছি, সে কেবল তুমি আমাদের ভালবাসতে বলে, আমাদের বিশ্বাস করতে বলে ; যদি মহারাজ, আজ তুমি সেই ভালবাসা ভুলে একজন পথের ভিখারীকে আমাদের সকলের উপরে বসালে, বাপ্পা আজ যদি তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সকলের চেয়ে বিশ্বাসী হল—তবে আমাদের আর কাজ কি ? বাপ্পাকেই এই মুসলমান যুদ্ধে সেনাপতি কর ; আমাদের বীরত্ব তো অনেকবার দেখা আছে, এবার নতুন সেনাপতি কেমন করে যুদ্ধ করেন

দেখা যাক।" মহারাজ মান চিরবিশ্বাসী রাজভক্ত সর্দারদের মুখে হঠাৎ এই নিষ্ঠুর কথা শুনে বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তাঁর আর কথা বলবার শক্তি থাকল না। তখন সেই প্রকাণ্ড রাজসভায় সেই বিদ্রোহী সর্দারদের মধ্যস্থলে পোনর বৎসরের বীর বালক বাপ্পাদিত্য উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন,—"শুনুন মহারাজ! আজ রাজস্থানের প্রধান প্রধান সর্দারেরা রাজসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন,—এ ঘোর বিপদের সময় বাপ্পাই এবার সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ চালান; তবে তাই হোক!" রাজা মান হতাশের মত চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, তারপর ধীরে ধীরে বল্লেন,—"তবে তাই হোক"। তারপর একদিক দিয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় মান রাজা চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন, আর একদিক দিয়ে বাপ্পাদিত্য সৈন্য সাজাতে বাহির হলেন।

বিদ্রোহী সর্দারদের মাথা হেঁট হল। তাঁরা মনে ভেবেছিলেন যে পোনর বৎসরের বালক বাপ্পা যুদ্ধে যেতে কখনই সাহস পাবে না,—সভার মাঝে অপমান হবে। কিন্তু যখন সেই বীর বালক নির্ভয়ে হাসিমুখে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ভার রাজার কাছে চেয়ে নিলে তখন তাঁদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁরা আরও আশ্চর্য্য হলেন, যখন সেই বাপ্পা—যাকে তাঁরা একদিন পথের ভিখারী বলে ঘৃণা করেছেন—পোনর বৎসরের সেই বালক বাপ্পা—যুদ্ধ জয় করে কোটি কোটি রাজপুত প্রজার আশীর্ব্বাদ, জয়জয়কারের মধ্যে একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে সমস্ত রাজস্থানের রাজমুকুটের সমান রাজপুতের রাজধানী চিতোর নগরে ফিরে এলেন; সেদিন সমস্ত রাজস্থান বেড়ে কি আনন্দ কি উৎসাহ!

নতুন সেনাপতি বাপ্পা সমস্ত রাজস্থানকে ভয়ঙ্কর মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করে যেদিন চিতোর নগরে ফিরে এলেন সেইদিন রাজা মানের বুড়ো বুড়ো সর্দারেরা ক্ষুণ্ণ মনে রাজসভা ছেড়ে গেলেন। মহারাজ মান

তাঁদের ফিরিয়ে আনতে কতবার কত চেষ্টা করলেন, কাকুতি মিনতি, এমন কি শেষে রাজগুরুকে পর্য্যন্ত তাঁদের কাছে পাঠালেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না; সর্দ্দারেরা দূতের মুখে বলে পাঠালেন,—"আমরা মহারাজের নিমক খেয়েছি এক বৎসর পর্য্যন্ত আমরা শত্রুতা করব না, বৎসর শেষ হলে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে।"

সেই এক বৎসর কত ভীষণ ষড়যন্ত্র, কত ভয়ঙ্কর পরামর্শে কেটে গেল। এক বৎসর পরে সেই বিদ্রোহী সর্দ্দারদের দুষ্ট পরামর্শে রাজা মানকে ভুল বুঝে বাপ্পা তাঁদের সকলের সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে চল্লেন। রাজা মান যখন শুনলেন, বাপ্পা তাঁর রাজসিংহাসন কেড়ে নিতে আসছেন; যখন শুনলেন, যে বাপ্পাকে তিনি পথের ধূলা থেকে একদিন রাজ-সিংহাসনের দিকে তুলে নিয়েছিলেন, যার দীনহীন বেশ একদিন তিনি রাজবেশ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন, যাকে তিনি প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভেবেছিলেন—হায়রে! সেই অনাথ আজ সমস্ত কৃতজ্ঞতা ভুলে তাঁরই রাজছত্র কেড়ে নিতে আসছে, তখন তাঁর দুই চক্ষে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল।

তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সে একা একদল রাজভক্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে গেলেন; সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ হল;—যুদ্ধক্ষেত্রে বাপ্পার হাতে মান রাজা প্রাণ দিলেন।

ষোল বৎসরে, বাপ্পা দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে, হিন্দুমুকুট, হিন্দুসূর্য্য, রাজগুরু, চাকুয়া উপাধি নিয়ে, চিতোরের রাজসিংহাসনে বসলেন। বালিয় ও দেব, দুটি ভাই ভীল, বাপ্পার কপালে রাজতিলক টেনে দিয়ে দুখানা গ্রাম বখশিশ্ পেলে। বাপ্পা সেইদিন নিয়ম করে দিলেন যে, তাঁর বংশের যত রাজা সকলকেই এই দুই ভীলের বংশাবলীর হাতে রাজটীকা নিয়ে সিংহাসনে বসতে হবে। আজও সেই নিয়ম চলে আসছে।

এই নতুন নিয়ম বাপ্পা রাজস্থানে যখন প্রচলিত কল্লেন, তখন, এই ভীলের হাতে রাজটীকা নেবার কথা যে শুন্‌লে, সেই মনে ভাবলে নতুন রাজার এ একটা নতুন খেয়াল; কিন্তু মান রাজার সভাপণ্ডিতেরা ভাবলেন ইনি কি তবে গিহেলোট রাজকুমার গোহের বংশীয়?—সূর্য্যবংশেই তো ভীলের হাতে রাজটীকা নেবার নিয়ম ছিল জানি! মহারাজ বাপ্পা, নাগাদিত্যের মহিষী চিতোররাজকুমারীর ছেলে নয়তো? রাজা মান, বাপ্পার মায়ের ভাই, মামা নয়তো?—ছি, ছি! বাপ্পা কি অধর্ম্ম কল্লেন;—চোরের মত মামার সিংহাসন আপনি নিলেন?—এমন নিষ্ঠুর রাজার রাজত্বে থাকাও যে মহাপাপ! পণ্ডিতেরা আর রাজসভার মুখো হলেন না,—একে একে চিতোর ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। হায়, তাঁরা যদি জানতেন বাপ্পা কত নির্দ্দোষ;—বাপ্পা স্বপ্নেও ভাবেননি রাজা মান তাঁর মামা! তিনি তাঁর পালক-পিতা, সেই বৃদ্ধ রাজপুরোহিতের কাছে ভীল-বিদ্রোহ, রাজা গোহ, গায়েব গায়েবীর গল্প শুনতেন বটে, কিন্তু তিনি জানতেন না যে, যার নিষ্ঠুর অত্যাচারে সরল ভীলরা একদিন ক্ষেপে উঠেছিল, সেই মহারাজ নাগাদিত্য তাঁর পিতা; তিনি জানতেন না যে, তাঁরই পূর্ব্বপুরুষ রাজকুমার গোহ,—যাঁকে রাণী পুষ্পবতী ব্রাহ্মণী কমলাবতীর হাতে সঁপে দিয়ে চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। বাপ্পা ভাবতেন তিনি কোন সামান্য রাজ্যের রাজপুত্র।

রাজা হবার পর বাপ্পা যখন দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে ফিরে আসেন, তখন বাণমাতাদেবীর সোনার মূর্ত্তি সঙ্গে এনেছিলেন। চিতোরের রাজপ্রাসাদে শ্বেত পাথরের মন্দিরে সোনার সেই দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে বাপ্পা প্রতিদিন দুই সন্ধ্যা পুজো করতেন।

অনেক দিন কেটে গেছে, বাপ্পা প্রায় বুড়ো হয়েছেন, সেই সময় একদিন ভক্তিভরে বাণমাতাকে প্রণাম করে ওঠবার সময় বাপ্পার গলা থেকে

ছেলেবেলার সেই তামার কবচ ছিঁড়ে পড়ল। বাপ্পা বড় হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু.সুতায় বাঁধা তামার কবচটি তাঁর গলায় যেমন তেমনিই ছিল ;—অনেক দিনের অভ্যাসে মনেই পড়ত না যে গলায় একটা কিছু আছে। আজ যখন হীরামোতির কুড়িগাছা হারের নীচে থেকে সেই পুরোনো কবচ খানি পায়ের তলায় ছিঁড়ে পড়ল তখন বাপ্পা চমকে উঠে ভাবলেন,—একি! এতদিন আমার মনেই ছিল না যে এতে লেখা আছে আমি কে, কোথায় ছিলুম ; আজ সব সন্ধান পাওয়া যাবে। বাপ্পা প্রফুল্ল মুখে সেই তামার কবচ মহারাণীর হাতে এনে দিয়ে বল্লেন ,—"পড়ত শুনি।" বাপ্পা নিজে এক অক্ষরও পড়তে জানতেন না। মহারাণী বাপ্পার পায়ের কাছে বসে পড়তে লাগলেন। কবচের একপিটে লেখা রয়েছে,—বাসস্থান ত্রিকূট পর্ব্বত, নগেন্দ্রনগর, পরাশর অরণ্য। বাপ্পা হাসি মুখে রাণীর কাঁধে হাত রেখে বল্লেন,—"এই আমার ছেলেবেলার দেশ, এইখানে কত খেলা খেলেছি! সেই ত্রিকূট পাহাড়, সেই আশী বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গম্ভীর মুখ, নগেন্দ্রনগরের ঝুলন পূর্ণিমায় সেই জ্যোৎস্না রাত্রি, সেই শোলাঙ্কি রাজকুমারীর মধুর হাসি, স্বপ্নের মত আমার এখনো মনে আসে। আমি কতবার কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু পৃথিবীতে তিনটে চুড়ো পাহাড় কত আছে কে তার সন্ধান পাবে! আমি যদি বলতে পারতেম যে সেই মেঘের মত তিনটে পাহাড়ের ঢেউকে 'ত্রিকূট' বলে, যদি বলতে পারতেম সেই ছোট সহরের নাম নগেন্দ্রনগর, যদি জানাতে পারতেম সেই ঘন বন, যেখানে আমি রাখালদের সঙ্গে খেলে বেড়াতেম, যেখানে ঝুলন পূর্ণিমায় শোলাঙ্কি রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেম, সেটি পরাশর অরণ্য, তবে কোন গোলই হতনা। হায় হায়! জন্মাবধি লেখা পড়া না শিখে এই ফল! এতকাল পরে কি আর সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সেই শোলাঙ্কি রাজনন্দিনীকে

ফিরে পাব ? পড়ত গুলি আর কি লেখা আছে।" রাণী কবচের আর এক পিঠ উল্টে পড়তে লাগলেন,—জন্মস্থান নাগিয়া পাহাড়, পিতা নাগাদিত্য, মাতা চিতোর-কুমারী, নাম বাপ্পা।

মহারাণীর বড় বড় চোখ মহাবিস্ময়ে আরও বড় হয়ে উঠল ;—তিনি তামার সেই কবচ-হাতে বাপ্পার পায়ের তলায়, ফুলের বিছানার মত সুন্দর গালিচায়, অবাক হয়ে বসে রইলেন ; আর গজদন্তের পালঙ্কের উপর বাপ্পা ডান হাতের আঙুলে এক ফোঁটা রক্তের মত বড় একখানা লালের আঙটীর দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন,—হায় হায়! কি পাপ করেছি! এই হাতে পিতৃহন্তা ভীলদের শাসন না করে, মামার প্রাণহন্তা হয়ে আমি সিংহাসনে বসেছি! মহারাণি! আমি মহাপাপী, আমি চিতোরের সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত নই। এখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আর আত্মীয়বধের প্রায়শ্চিত্ত আমার জীবনের ব্রত হল।"

একলিঙ্গের দেওয়ান বাপ্পা সেই দিনই সকলের কাছে বিদায় হয়ে, দশ হাজার দেওয়ানী ফৌজ নিয়ে চিতোর থেকে বার হলেন। তাঁর সমস্ত রাগ নাগিয়া পাহাড়ে ভীল রাজত্বের উপর গিয়ে পড়ল। বাপ্পা নাগিয়া পাহাড় জয় করে ভীল রাজত্ব ছারখার করে চলে গেলেন। তার পর, দেশ বিদেশ,—কাশ্মীর, কাবুল, ইস্পাহান, কান্দাহার, ইরাণ, তুরাণ, জয় করলেন। বাপ্পার সকল সাধ পূর্ণ হল ;—নাগিয়া পাহাড় জয় করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধের সাধ পূর্ণ হল ; আধখানা পৃথিবী চিতোর সিংহাসনের অধীনে এনে আত্মীয়বধের কষ্ট অনেকটা দূর হল ;—কিন্তু তবু মনের শান্তি প্রাণের আরাম কোথায় পেলেন ? বাপ্পা যখন সমস্ত দিন যুদ্ধের পর, শ্রান্ত হয়ে নিজের শিবিরে বসে থাকতেন, যখন নিস্তব্ধ যুদ্ধক্ষেত্র কোন দিন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় আলোময় হয়ে যেত, তখন বাপ্পার সেই ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে চাঁপাগাছের ঝুলনায় শোলাঙ্কি

রাজকুমারীর হাসি-মুখ মনে পড়ত; যখন কোন নূতন দেশ জয় করে বাপ্পা সেখানকার নূতন রাজপ্রাসাদে সোনার পালঙ্কে নহবতের মধুর স্বর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন সেই পূর্ণিমার রাতে চাঁপাগাছের চারিদিক ঘিরে ঘিরে রাজকুমারীর সখীদের সেই ঝুলন-গান স্বপ্নের সঙ্গে বাপ্পার প্রাণে ভেসে আসত। শেষে যে দিন তিনি নগেন্দ্রনগরে গিয়ে দেখলেন তাঁদের পাতার কুটীর, মাটির দেওয়াল, মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, যখন দেখলেন, শোলাঙ্কি রাজার রাজবাড়ি জনশূন্য, নিস্তব্ধ, অন্ধকার হয়ে পড়ে আছে,—সে রাজকুমারীও নেই, সে সখীও নেই, তখন বাপ্পার মন একেবারে ভেঙে গেল;—তিনি শান্তিহারা পাগলের মত সেই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে শান্তির আশায় এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন;—চিতোরের প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, শূন্য সিংহাসন আর অন্দরে একা মহারাণীকে নিয়ে, পড়ে রইল।

এই রকম দেশে বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে বাপ্পা একদিন বল্লভীপুরে গায়নী নগরে—যেখানে দুটি ভাই বোন গায়েব গায়েবী পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিলেন সেইখানে—উপস্থিত হলেন। এক দিন, ষোল বৎসর বয়সে, রাজা মানের সেনাপতি হয়ে বাপ্পা মুসলমান সুলতান সেলিমের সমস্ত সৈন্য এই গায়নী নগর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে চিতোরে ফিরে গিয়েছিলেন; আজ কত বৎসর পরে যখন কালো চুলে পাক ধরেছে, যখন চোখের কোলে কালি পড়েছে, গায়ের মাংস লোল হয়েছে, পৃথিবী যখন তাঁর কাছে অনেকটা পুরোনো হয়ে এসেছে, সেই সময় বাপ্পা আর একবার সেই গায়নীনগরে ফিরে এলেন। গায়নীনগর দেখে বাপ্পার সেই দুটি ভাই বোন গায়েব গায়েবীর গল্প মনে পড়ল।

বাপ্পাদিত্য সেই সূর্য্যকুণ্ডের জলে সূর্য্য পূজা করে, গায়নীর রাজ-প্রাসাদে শ্বেত পাথরের শয়ন-মন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। হঠাৎ

অর্দ্ধেক রাত্রে, কার একটি মধুর গান শুনতে শুনতে বাপ্পার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শয়ন-মন্দির থেকে পাথরের ছাতে বেরিয়ে দাঁড়ালেন ;—সম্মুখে মুসলমানদের প্রকাণ্ড মসজিদ্ জ্যোৎস্নার আলোয় ধপ্ ধপ্ করছে, আকাশে আধখানি চাঁদ, চারিদিক নিষুতি। বাপ্পা জ্যোৎস্নার আলোয় দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, এ গান যেন কোথায় শুনেছেন। হঠাৎ দক্ষিণের হাওয়ায় গানের কথা আরো স্পষ্ট হয়ে বাপ্পার কানের কাছে ভেসে এল ; বাপ্পা চমকে উঠে শুনলেন,—"আজ কি আনন্দ, ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ !"—এ যে সেই গান ! নগেন্দ্র-নগরে রাজপুত রাজকুমারীর ঝুলন গান !

বাপ্পা ছাতের উপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন ; নীচে দেখলেন এক ভিখারিণী রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাইছে,—"আজি কি আনন্দ—।" বাপ্পা তৎক্ষণাৎ সেই ভিখারিণীকে ডেকে পাঠালেন ;—সেই চাঁদের আলোয় নির্জ্জন শ্বেত পাথরের ছাতে, পথের ভিখারিণী, রাজ্যেশ্বর বাপ্পার সম্মুখে এসে, দাঁড়াল। বাপ্পা জিজ্ঞাসা করলেন,—"কে তুমি ? তুমি কি নগেন্দ্রনগরের শোলাঙ্কি রাজকুমারী ? তুমি কি কখন ঝুলন পূর্ণিমায় এক রাখাল বালককে বিয়ে করেছিলে ?" ভিখারিণী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে বাপ্পার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর একটুখানি হেসে বল্লে,—"মহারাজ, অর্দ্ধেক রাত্রে ভিখারিণীকে ডেকে একি তামাসা।" বাপ্পা বল্লেন,—"তবে কি তুমি রাজকুমারী নও ?" ভিখারিণী নিশ্বাস ফেলে বল্লে,—"আমি একদিন রাজকুমারী ছিলাম বটে, আজ ভিখারিণী। মহারাজ, আমি মুসলমান নবাব সেলিমের কন্যা। একদিন, পোনের বৎসর বয়সে, তুমি আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলে, সে দিন আমি এই রাজপ্রাসাদের এই ছাতের উপর থেকে তোমায় দেখেছিলেম ;—কি সুন্দর মুখ, কি প্রকাণ্ড শরীর। আর আজ তোমায় কি দেখছি !—সে শরীর নাই, সে হাসি নাই। এমন দশা

তোমার কে কল্লে ? কোন্ রাজপুত কুমারীর আশায় তুমি পাগলের মত দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ ?" বাপ্পা বল্লেন,—"সে কথা থাক্, তুমি আবার সেই গান গাও"। ভিখারিণী গাইতে লাগল—"আজি কি আনন্দ ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ।" বাপ্পা সমস্ত দুঃখ ভুলে সেই ভিখারিণীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। গান শেষ হল ; বাপ্পা বল্লেন,—"নবাবজাদী, তোমায় কি দিব বল ?" ভিখারিণী বল্লে,—"আমার যদি রাজ্য থাকতো তবে তোমায় বলতেম আমায় বিয়ে করে তোমার বেগম কর—কিন্তু সে আশা এখন নাই, এখন আমি ভিখারিণী যে! আমাকে তোমার বাঁদী করে কাছে কাছে রাখ।" বাপ্পা বল্লেন,—"তুমি বাঁদী হবার যোগ্য নও, আমি তোমায় বেগম করব, তুমি চিরদিন আমার কাছে বসে এই গান গাইবে।"

তার পর দিন, সেই মুসলমান-কন্যাকে বিয়ে করে বাপ্পা খোরাসান দেশে চলে গেলেন। সেখানে গুলবাগে খাসমহলে গোলাবের ফোয়ারার ধারে সিরাজির পেয়ালা হাতে বেগম সাহেবার মুখে আরবী গজল আর সেই হিন্দুস্থানের ঝুলন গান শুনতে শুনতে বাপ্পা প্রাণের আরাম, মনের শান্তি পেয়েছিলেন কিনা কে জানে!

এক শত বৎসর বয়সে বাপ্পার মৃত্যু হল। পূর্ব্বদিকে, হিন্দুস্থানে তাঁর হিন্দু মহিষী, হিন্দু প্রজারা ; পশ্চিমে, ইরাণীস্থানে তাঁর মুসলমানী বেগম আর পাঠানের দল ;—হিন্দুরা তাদের মহারাজকে চিতায় তুলে দিতে চাইলে, আর নৌসেরা পাঠানের দল তাঁকে মুসলমানের মত কবর দিতে ব্যস্ত হল। শেষে যখন এক পিঠে সূর্য্যের স্তব আর এক পিঠে আল্লার দোয়া লেখা প্রকাণ্ড কিংখাবের চাদর বাপ্পার উপর থেকে খুলে নেওয়া হল, তখন সেখানে আর কিছুই দেখা গেল না,—কেবল রাশি রাশি পদ্ম ফুল আর গোলাপ ফুল! চিতোরের মহারাণী সেই পদ্ম ফুল বাণমাতাজীর

মন্দিরে মানসসরোবরের জলে রেখে দিলেন; ইরাণী বেগম একটি গোলাপ ফুল, সখের গুলবাগে খাসমহলের মাঝে গোলাপ জলের ফোয়ারার ধারে, পুঁতে দিলেন; আর সেই দিন হিন্দুস্থান ও ইরাণীস্থানের মধ্যস্থলে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের শিখরে হীরে জহরতে মোড়া এক রাজার শরীর চিতার উপরে তুলে দিয়ে এক সন্ন্যাসিনী বল্লেন,—"সখী, তোরা সেই গান গা।" চারিদিকে চার সন্ন্যাসিনী ঘিরে ঘিরে গাইতে লাগল,—"আজি কি আনন্দ!" সন্ন্যাসিনী সেই শোলাঙ্কি রাজকুমারী; আর সেই রাজদেহ বাপ্পার মৃতদেহ;—দুজনে চিরদিন দুজনের সন্ধানে ফিরেছিলেন, কিন্তু ইহলোকে মিলন হয়নি।

পদ্মিনী

বাপ্পাদিত্যের সময় মুসলমানেরা ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেন। তার পর থেকে সূর্য্যবংশের অনেক রাজা, অনেকবার চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন, রাজসিংহাসন নিয়ে কত ভায়ে ভায়ে বিচ্ছেদ, কত মহা মহা যুদ্ধ, কত রক্তপাত কত অশ্রুপাতই হয়ে গেছে; কিন্তু এত রাজা, এত যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে কেবল জনকতক রাজার নাম আর গুটিকতক যুদ্ধের কথা সমস্ত রাজপুতের প্রাণে এখনও সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন, মহারাজ খোমান, যিনি চব্বিশবার মুসলমানের হাত থেকে চিতোরকে রক্ষা করেছিলেন, যিনি আরব্য-উপন্যাসের সেই বোগদাদের খলিফ হারুণ আল রসীদের ছেলে আলমামুনকে চিতোরের রাজপ্রাসাদে অনেক দিন বন্দী রেখেছিলেন, আশীর্ব্বাদ করেতে হলে এখনো যাঁর নাম করে রাজপুতেরা বলে,—"খোমান তোমায় রক্ষা করুন"; আর একজন রাজা, মহারাজ সমরসিং, যেমন বীর তেমনি ধার্ম্মিক! তিনি যখন নাগা সন্ন্যাসীর মত মাথার উপর ঝুঁটি বেঁধে পদ্মবীজের মালা-গলায় ভবানীর খাঁড়া হাতে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসতেন, তখন বোধ হত যেন সত্যই ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান কৈলাস থেকে পৃথিবীতে রাজত্ব করতে এসেছেন। তখনকার দিল্লীশ্বর চৌহান পৃথ্বীরাজের হাত থেকে শাহাবুদ্দীন ঘোরি যখন দিল্লীর সিংহাসনের সঙ্গে অর্দ্ধেক ভারতবর্ষ কেড়ে নিতে এসেছিলেন, সেই সময় এই মহারাজ সমরসিংহ তেরো হাজার রাজপুত আর নিজের ছেলে কল্যাণকে নিয়ে অর্দ্ধেক ভারতবর্ষের রাজা পৃথ্বীরাজের পাশে পাশে, কাগার নদীর তীরে, মুসল-

মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ। পৃথ্বীরাজ সমরসিংহের প্রাণের বন্ধু; তাঁর আদরের মহিষী মহারাণী পৃথার ছোট ভাই, দুজনে বড় ভালবাসা ছিল। তাই বুঝি এই শেষ যুদ্ধে সমরসিং জন্মের মত বন্ধুত্বের সমস্ত ধার শুধে দিয়ে চলে গেলেন। যখন যুদ্ধের দিনে প্রলয়ের ঝড়-বৃষ্টির মাঝে পৃথ্বীরাজের লক্ষ লক্ষ হাতীঘোড়া, সৈন্যসামন্ত ছিন্নভিন্ন, ছারখার হয়ে গেল, যখন জয়ের আর কোন আশা নেই, প্রাণের মায়া কাটাতে না পেরে যখন প্রায় সমস্ত রাজাই পৃথ্বীরাজকে বিপদের মাঝে রেখে একে একে নিজের নিজের রাজত্বের মুখে পালিয়ে চল্লেন, তখন, একমাত্র সমরসিং, স্ত্রীপুত্রপরিবার, রাজমুকুট, রাজসিংহাসন তুচ্ছ করে প্রাণের বন্ধু পৃথ্বীরাজের জন্য মুসলমানের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। আগে সেই ধর্ম্মাত্মা মহাবীর সমরসিংহ, তাঁর ষোল বছরের ছেলে কল্যাণ আর সেই তেরো হাজার রাজপুতের বুকের রক্তে কাগার নদীর বালুচর রাঙা হয়ে গেল, তবে পৃথীরাজ বন্দী হলেন, তবে দিল্লীর হিন্দু-সিংহাসন মুসলমান বাদশা শাহাবুদ্দিনের হস্তগত হল। এখন সে শাহাবুদ্দিন কোথায়, কোথায় বা সে দিল্লীব রাজতক্ত! কিন্তু যে ধর্ম্মাত্মা, বন্ধুর জন্যে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ কল্লেন, সেই মহাবীর সমরসিংহের নাম, রাজপুত কবিদের সুন্দর গানের মধ্যে, চিরকাল অমর হয়ে আছে;—এখনও রাজপুতনায় সেই গান গেয়ে কত লোক রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে!

সমরসিংহের পর থেকে প্রায় একশ বৎসর কেটে গেছে। চিতোরের রাজসিংহাসনে তখন রাণা লক্ষণ সিংহ আর দিল্লীতে পাঠান বাদশা আল্লাউদ্দিন। সেই সময় একদিন রাণা লক্ষণ সিংহের কাকা ভীমসিং, সিংহল দ্বীপের রাজকুমারী পদ্মিনীকে বিয়ে করে সমুদ্রপার থেকে, চিতোরে ফিরে এলেন। পদ্মের সৌরভ যেমন সমস্ত সরোবর প্রফুল্ল করে' ক্রমে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে যায়, তেমনি কমলালয়া লক্ষ্মীর সমান সুন্দরী সেই

পদ্মমুখী রাজপুতরাণী পদ্মিনীর রূপের মহিমা, গুণের গরিমা দিনে দিনে সমস্ত ভারতবর্ষ আমোদ করে। কি দীন দুঃখীর সামান্য কুটীর, কি রাজাধিরাজের রাজপ্রাসাদ এমন সুন্দরী এ হেন গুণবতী কোথাও নাই।

এই আশ্চর্য্য সুন্দরী পদ্মিনীকে নিয়ে ভীমসিংহ যখন চিতোরের একধারে, সাদাপাথরে বাঁধানো সরোবরের মধ্যস্থলে, রাজ-অন্তঃপুরে, শীতল কোঠায় সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন ; সেই সময়ে একদিন, দিল্লীতে, তখনকার পাঠান বাদশা আল্লাউদ্দীন, খাসমহলের ছাতে গজদন্তের খাটিয়ায় বসে বসন্তের হাওয়া খাচ্ছিলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছিল, পাশে সরবতের পেয়ালা হাতে পিয়ারী বেগম বসেছিলেন, পায়ের কাছে বেগমের এক নতুন বাঁদী সারঙ্গীর সুরে গজল গাইছিল। বাদশা হঠাৎ বলে উঠলেন, —"কি ছাই, আরবী গজল! হিন্দুস্থানের গান গাও!" তখন পিয়ারী বেগমের নতুন বাঁদী নতুন করে সারঙ্গী বেঁধে নতুন সুরে গাইতে লাগল,—"হিন্দুস্থানে এক ফুল ফুটে ছিল তার দোসার নাই, তার জুড়ি নাই। সে কি ফুল? সে কি ফুল? আহা সে যে পদ্ম ফুল, সে যে পদ্ম ফুল!—চারিদিকে নীল জল, মাঝে সেই পদ্ম ফুল! দেবতারা সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, মানুষে সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, চারিদিকে অপার সিন্ধু তরঙ্গভঙ্গে গর্জ্জন করছিল! কার সাধ্য সে সমুদ্র পার হয়, কার সাধ্য সে রাজার বাগিচায় সে ফুল তোলে ; সে রাজার ভয়ে দেবতারাও কম্পমান!" আল্লাউদ্দীন বলে উঠলেন,—"আমি হিন্দুস্থানের বাদশা, আমি কোন রাজারও তোয়াক্কা রাখিনা, কোন দেবতাকেও ভয় করি না। পিয়ারী! আমি কালই সেই পদ্মফুল তুলতে যাব!" বাঁদী আবার গাইতে লাগল,—"কে সে ভাগ্যবান সিন্ধু হল পার? কে সে গুণবান তুলিল সে ফুল?—মেবারের রাজপুতবীরের সন্তান! রাণা ভীমসিং! নির্ভয় সুন্দর!"

আল্লাউদ্দীন কিংখাবের মছলন্দে সোজা হয়ে বসলেন, আনন্দের সুরে গান শেষ হল,—"আজ চিতোরের অন্তঃপুরে সে ফুল বিরাজে, কবি যার নাম গায় ভারতে, তার দোসর কোথা। জগতে তার জুড়ি কই। ধন্য রাণা ভীমসিং। ধন্য রাজরাণী, চিতোরের রাজউদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিনী।" আল্লাউদ্দীনের কানে অনেকক্ষণ ধরে বাজতে লাগল—"চিতোরের রাজউদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিনী।" তিনি আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে উঠলেন,—"বাঁদী তুই কি স্বচক্ষে পদ্মিনীকে দেখেছিস্? সে কি সত্যই সুন্দরী?" বাঁদী উত্তর কল্লে,—"জাঁহাপনা। দিল্লী আসবার আগে আমি চিতোরে নাচগান করে জীবন কাটাতেম; পদ্মিনীর বিয়ের রাত্রে আমি রাণীর মহলে নেচে এসেছি।"

আল্লাউদ্দীন গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন, কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন,—"পিয়ারী আমার ইচ্ছে করে পদ্মিনীকে এই খাসমহলে নিয়ে আসি।" পিয়ারী বেগম বলে উঠলেন,—"শাহেনশা, আমার সাধ যায় আকাশের চাঁদটাকে সোনার কৌটায় পুরে রাখি।" কথাটা আল্লাউদ্দীনের ভাল লাগল না। দিল্লীর বাদশা যাঁর মুঠোর ভিতর অর্দ্ধেক ভারতবর্ষ তিনি কি একজন রাজপুত-রাণীকে ধরে আনতে পারেন না? শাহেনশা মুখ গম্ভীর করে উঠে গেলেন;—মনে মনে বলে গেলেন —"থাকো পিয়ারী, যদি পদ্মিনীকে আনতে পারি তবে তোমাকে তার বাঁদী হয়ে থাকতে হবে।"

তার পর দিন, লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে আল্লাউদ্দীন চিতোরের মুখে চলে গেলেন। পাঠান সৈন্য যে দিক দিয়ে গেল, সে দিকে, পথের দুই ধারে, ধানের ক্ষেত, লোকের বসতি ছারখার করে যেতে লাগল।

তখন বসন্তকাল। সমস্ত চিতোর জুড়ে দিকে দিকে আনন্দের রোল উঠেছে,—"হোরি হায়, হোরি হায়।" ঘরে ঘরে আবীরের ছড়াছড়ি,

রাণা ভীমসিংহ ও রাণী পদ্মিনী।

কান্তিক প্রেস, কলিকাতা।

হাসির হো হো, আর বাসন্তী রঙের বাহার। সেই ফাগুনে, ভরা আনন্দ আর হাসিখেলার মাঝখানে, একদিন চিতোরে খবর পৌঁছল, আল্লা-উদ্দীন আসছেন;—ঝড়ের মুখে প্রদীপের মত চিতোরের সমস্ত আনন্দ এক নিমিষে নিবে গেল। তখন কোথায় রইল রাণার রাজসভায় ধ্রুপদ খেয়ালে হোরি বর্ণনা, কোথা রইল রাণীদের অন্দরে 'ফাগুনমে হোরি মচাও' বলে মিষ্টি সুরে মধুর গান, কোথায় লালে লাল রাস্তায় দলে দলে হাসি তামাসা আর কোথায় বা গোপালজীর মন্দির থেকে রাগ বসন্তে নওবতের সুর। আবীরে গোলাপে লালে লাল চিতোরের ঘরে ঘরে অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনার সঙ্গে আর এক ভয়ঙ্কর খেলার আয়োজন চলতে লাগল;—সে খেলা লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা,—তাতে বুকের রক্ত, ছুরির ঘা, কামানের গর্জ্জন আর যুদ্ধের খোলা মাঠ। শেষে একদিন পাঠান বাদশার কালো নিশান শকুনির মত মেবারের মরুভূমির উপরে দেখা দিলে। ভীমসিং হুকুম দিলেন, কেল্লার দরজা বন্ধ কর। ঝন্ ঝন্ শব্দে চিতোরের সাতটা ফটক তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

আল্লাউদ্দীন ভেবেছিলেন,—যাব আর পদ্মিনীকে কেড়ে আনব; কিন্তু এসে দেখলেন, বুকের পাঁজর প্রাণের চারিদিক যেমন ঢেকে রাখে, তেমনি রাজপুতের তলোয়ার পদ্মিনীর চারিদিকে দিবারাত্রি ঘিরে রয়েছে। সমুদ্র পার হওয়া সহজ, কিন্তু এই সাতটা ফটক পার হয়ে চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে কেড়ে আনা অসম্ভব। পাঠান বাদশা পাহাড়ের নীচে তাম্বু গাড়বার হুকুম দিলেন।

সেই দিন গভীর রাত্রে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন শেষ করে রাণা ভীমসিং পদ্মিনীর কাছে এসে বল্লেন,—"পদ্মিনী, তুমি কি সমুদ্র দেখতে চাও? যেমন অনন্ত নীল সমুদ্রের ধারে তোমাদের রাজ-প্রাসাদ ছিল তেমনি সমুদ্র?" পদ্মিনী বল্লেন,—"তামাসা রাখ, তোমাদের এ মরুভূমির

দেশে আবার সমুদ্র পেলে কোথা থেকে?" ভীমসিংহ পদ্মিনীর হাত ধরে কেল্লার ছাতে উঠলেন। আকাশ অন্ধকার;—চন্দ্র নাই, তারা নাই। পদ্মিনী দেখলেন, সেই অন্ধকার আকাশের নীচে আর একখানা কালো অন্ধকার কেল্লার সম্মুখ থেকে মরুভূমির ওপার পর্য্যন্ত জুড়ে রয়েছে। পদ্মিনী বলে উঠলেন,—"রাণা, এখানে সমুদ্র ছিল আমি তো জানি না; মাগো, সাদা সাদা ঢেউ উঠ্‌ছে দেখ।" ভীমসিং হেসে বল্লেন,—"পদ্মিনী এ যে-সে সমুদ্র নয়;—ও পাঠান বাদশার চতুরঙ্গ সৈন্যবল। ঐ দেখ, তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত শিবিরশ্রেণী, জলের কল্লোলের মত, ঐ শোন, সৈন্যের কোলাহল। আজ আমার মনে হচ্ছে, সেই নীল সমুদ্র, যার বুকের মাঝ থেকে আমি একটি সোনার পদ্মফুলের মত তোমায় ছিঁড়ে এনেছি, সেই সমুদ্র যেন আজ এই চতুরঙ্গিনী মূর্ত্তি ধরে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছে। কেমন করে যে এই বিপদসাগর পার হব ভাবছি।" ভীমসিং আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ একটা কাল পেঁচা চীৎকার করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল; তার প্রকাণ্ড দুখানা কালো ডানার ঠাণ্ডা বাতাস, সে অন্ধকার ছাতে, রাণারাণীর মুখের উপর, কার যেন দুখানা ঠাণ্ডা হাতের মত, বুলিয়ে গেল। পদ্মিনী চমকে উঠে রাণার হাত ধরে নেবে গেলেন। সমস্ত রাত ধরে তাঁর মন বলতে লাগল, একি অলক্ষণ। একি অলক্ষণ।

তার পরদিন পূবের আকাশে ভোরের আলো সবেমাত্র দেখা দিয়েছে এমন সময় একজন রাজপুত সওয়ার পাঠানশিবিরে উপস্থিত হল। বাদশা আল্লাউদ্দীন তখন রূপোর কুর্সিতে বসে তশবী দানা জপ করছিলেন; খবর হল,—"রাণা লক্ষণ সিংহের দূত হাজির।" বাদশা হুকুম দিলেন,—"হাজির হোনেকো কহো।" রাণার দূত তিনবার কুর্নিশ করে বাদশাহের সামনে দাঁড়িয়ে বল্লে—"রাণা জানতে চান বাদশাহের সঙ্গে

তাঁর কিসের বিবাদ যে, আজ এত সৈন্য নিয়ে তিনি চিতোরে উপস্থিত হলেন?" আল্লাউদ্দীন উত্তর কল্লেন,—"রাণার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নাই, আমি রাণার খুড়ো ভীম সিংহের কাছে পদ্মিনীকে ভিক্ষা চাইতে এসেছি, তাঁকে পেলেই দেশে ফিরব।" দূত উত্তর কল্লে,—"শাহেনশা, আপনি রাজপুত জাতকে চেনেন না সেই জন্য এমন কথা বলছেন। রাণার কথা ছেড়ে দিন, আমরা দুঃখী রাজপুত আমরাও প্রাণ দিতে পারি, তবু মান খোয়াতে পারি না। আপনি রাণীর আশা পরিত্যাগ করুন, বরং শাহেনশার যদি অন্য কিছু নেবার ইচ্ছে থাকে তবে—" আল্লাউদ্দীন দূতের কথায় বাধা দিয়ে বল্লেন,—"হিন্দুস্থানের বাদশার এক কথা,—হয় পদ্মিনী, নয় যুদ্ধ।" রাণার দূত পিছু হটে তিনবার কুর্নিশ করে বিদায় হল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা চিতোরের রাজসভায় সমস্ত রাজপুত সর্দার একত্র হলেন। কি করে চিতোরকে মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করা যায়?—রাজস্থানের রাজ-মুকুটের সমান চিতোর, রাজপুতের প্রাণের চেয়ে প্রিয় চিতোর! মুসলমানেরা প্রায় ভারতবর্ষ গ্রাস করেছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে কত বড় বড় হিন্দু রাজার রাজত্ব ছারখার হয়ে একেবারে লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু চিতোরের সিংহাসন সেই পুরাকালের মত এখনও অটল, এখনও স্বাধীন আছে!—কি করে আজ এই ঘোর বিপদে চিতোরকে উদ্ধার করা যায়। অনেকক্ষণ ধরে অনেক পরামর্শ, তর্ক বিতর্ক চল্লো। শেষে রাণা ভীমসিংহ উঠে বল্লেন,—"পদ্মিনীর জন্যে যখন চিতোরের এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তখন না হয় পদ্মিনীকেই পাঠানের হাতে দেওয়া যাক, আমার তাতে কোন দুঃখ নেই; চিতোর আগে না পদ্মিনী আগে!" কথাটা বলে ভীমসিংহ একবার রাজসভার একপারে, যেখানে শ্বেত পাথরের জালির পিছনে চিতোরের রাণীরা বসেছিলেন সেই দিকে, চেয়ে

দেখলেন; তারপর সিংহাসনের দিকে ফিরে বল্লেন,—"মহারাণা কি বলেন?" লক্ষ্মণ সিংহ বল্লেন,—"যদি সমস্ত সর্দ্দারের তাই মত হয় তবে তাই করা কর্ত্তব্য।" তখন সেই রাজভক্ত রাজপুত সর্দ্দারদের প্রধান, রাজসভায় উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন,—"রাণার বিপদে আমাদের বিপদ, রাণার অপমানে আমাদেব অপমান! পদ্মিনী শুধু ভীমসিংহের নয় তিনি আমাদের রাণী বটে। কেমন করে আমরা তাঁকে পাঠানের বেগম হতে পাঠিয়ে দেব? পৃথিবী শুদ্ধ লোকে বলবে, রাজস্থানে এমন পুরুষ ছিল না যে, তার রাণীর হয়ে লড়ে। মহারাণা, আমরা প্রস্তুত, হুকুম হলেই যুদ্ধে যাই।" মহারাণা হুকুম দিলেন—"আপাততঃ যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, সাবধানে কেল্লাব দবজা বন্ধ রাখ, আল্লাউদ্দীন যতদিন পারে চিতোব ঘিরে বসে থাকুক।" সভাস্থলে ধন্য ধন্য পড়ে গেল, চারিদিকে চিতোরেব সমস্ত সামন্ত সর্দ্দার তলোয়ার খুলে দাঁড়ালেন, সমস্ত রাজসভা এক সঙ্গে বলে উঠল,—"জয় মহারাণার জয়, জয় ভীমসিংহের জয়, জয় পদ্মিনীর জয়।" রাজসভা ভঙ্গ হল। সেই সময় রাজসভার এক পারে, সেই শ্বেত পাথরের জালিব আড়াল থেকে, সোনার পদ্মফুল লেখা একখানি লাল রুমাল সেই রাজভক্ত সর্দ্দারদেব মাঝে এসে পড়ল। সর্দ্দারেরা পদ্মিনীর হাতের সেই লাল রুমাল বল্লমের আগায় বেঁধে 'রাণীর জয়' বলে রাজসভা থেকে বিদায় হলেন।

তারপব, দিন কাটতে লাগল। আল্লাউদ্দীন লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে চিতোরের কেল্লা ঘিরে বসে রইলেন। বাদশাব আশা ছিল যে, কেল্লার ভিতর বন্ধ থেকে রাজপুতদের সমস্ত খাবার ফুরিয়ে যাবে, তখন তারা প্রাণের দায়ে পদ্মিনীকে পাঠিয়ে দিয়ে সন্ধি করবে; কিন্তু দিনের পর দিন, মাসেব পর মাস, ক্রমে সম্বৎসব কেটে গেল, তবু সন্ধিব নামগন্ধ নেই! বর্ষা, শীত কেটে গিয়ে গ্রীষ্ম কাল এসে পড়েছে, পাঠান সৈন্যেরা দিল্লীতে

ফেববার জন্যে অস্থির হতে লাগল, এমন গরমের দিনে দিল্লীতে চাঁদনী চৌকে কত মজা! সেখানে কাফিখানায় কত আমোদ চলেছে; আর তারা কিনা, কি বর্ষা, কি হিম, এই হিন্দুব মুল্লুকে এসে খোলা মাঠে পড়ে রয়েছে?—এখানে না পাওয়া যায় ভাল পান-তামাক, না আছে ফুলের বাগিচা, না আছে একটা লোকের মিষ্টি গলা—যাব গান শুনলেও ভুলে থাকা যায়। এখানকার লোকগুলোও যেমন কাটখোট্টা, তাদের গান গুলোও তেমনি বেসুরো, পান গুলোও তেমনি পুরু, তামাকটাও তেমনি কড়ুয়া। এ হিঁদুর মুল্লুকে আর মন টেঁকে না।

আল্লাউদ্দীন দেখলেন, নিষ্কর্ম্মা বসে থেকে তাঁর সৈন্যেরা ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠছে। তাঁর ইচ্ছা আরো কিছু দিন চিতোর ঘিরে বসে থাকেন;—যে কোন উপায়ে হোক্ সৈন্যদের স্থির রাখতে হবে। বাদশা তখন এক এক দিন, এক এক দল সৈন্য নিয়ে শিকার করে বেড়াতে লাগলেন। সেই সময় এক দিন শিকার শেষে আল্লাউদ্দীন শিবিরে ফিরে আসছেন;—একদিকে সবুজ জনারের ক্ষেত সন্ধ্যার অন্ধকারে কাজলের মত নীল হয়ে এসেছে, আর এক দিকে পাহাড়েব উপর চিতোরের কেল্লা মেঘের মত দেখা যাচ্ছে, মাঝে সুঁড়ি পথ; সেই পথে প্রথমে শিকারী পাঠানের দল বড় বড় হবিণ ঘাড়ে গাইতে গাইতে চলেছে, তার পর বড় বড় আমীর ওমরা কেউ হাতীর পিঠে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে, চলেছেন; সব শেষে বাদশা আল্লাউদ্দীন;—এক হাতে ঘোড়াব লাগাম আর হাতে সোনার জিঞ্জীর বাঁধা প্রকাণ্ড একটা শিকরে পাখী। বাদশা ভাবতে ভাবতে চলেছেন, এতদিন হয়ে গেল তবু তো চিতোর দখল হল না। সৈন্যেরা দিল্লী ফেরবার জন্য ব্যস্ত, আর কত দিন তাদের ভুলিয়ে রাখা যায়? যে পদ্মিনীর জন্য এত সৈন্য নিয়ে এত কষ্ট সয়ে বিদেশে এলেম, সে পদ্মিনীকে তো একবাব চক্ষেও দেখতে পেলেম না। বাদশা একবার বাঁ হাতের উপর প্রকাণ্ড

শিক্‌রে পাখীটার দিকে চেয়ে দেখলেন। হয়তো তাঁর মনে হচ্ছিল,—কোন রকমে দুখানা ডানা পাই, তবে এই বাজটার মত চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে ছোঁ মেরে নিয়ে আসি। হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকারে দুখানি ডানার একটুখানি ঝটাপট সেই ঘুমন্ত শিক্‌রে পাখীর কানে পৌঁছল, সে ডানা ঝেড়ে ঘাড় ফুলিয়ে বাদশার হাতে সোজা হয়ে বসল; আল্লাউদ্দীন বুঝলেন, তাঁর শিকারী বাজ নিশ্চয়ই কোন শিকারের সন্ধান পেয়েছে। তিনি আকাশে চেয়ে দেখলেন, মাথার উপর দিয়ে দুখানি পান্নার টুকরোর মত এক জোড়া শুক শারী উড়ে চলেছে। বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন;—তখন সেই প্রকাণ্ড পাখী বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার আকাশে উঠে কালো দুখানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর একবারে তিন শ' গজ আকাশের উপর থেকে, একটুকরো পাথরের মত, সেই দুটী শুক শারীর মাঝে এসে পড়ল। বাদশা দেখলেন, একটি পাখী ভয়ে চীৎকার করতে করতে সন্ধ্যার আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর একটি পাখী প্রকাণ্ড সেই বাজের থাবার ভিতর ঝটপট করছে। তিনি শিশ্‌ দিয়ে বাজ পাখীকে ফিরে ডাকলেন, পোষা বাজ শিকার ছেড়ে বাদশার হাতে উড়ে এল; আর ভয়ে মৃতপ্রায় সেই সবুজ শুক ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ল। বাদশা আনন্দে সেই তোতা পাখী তুলে নিতে হুকুম দিয়ে শিবিরের দিকে ঘোড়া ছোটালেন; আর সেই তোতা পাখীর জোড়া পাখীটি প্রথমে করুণ সুরে ডাকতে ডাকতে সেই শিকারীদের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার আকাশ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উড়ে চল্লো; শেষে, ক্রমে ক্রমে, আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে যে ওমরাহের হাতে একটি ছোট খাঁচায় ডানা-ভাঙা তার সঙ্গী তোতা ছট্‌ফট্‌ কচ্ছিল, সেই খাঁচার উপর নির্ভয়ে এসে বস্‌ল। ওমরাহ আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠলেন,—"কি আশ্চর্য্য

সাহস! তোতার বিপদ দেখে তুতী এসে আপনিই ধরা দিয়েছে।" আল্লাউদ্দীন তখন পদ্মিনীর কথা ভাবতে ভাবতে চলেছিলেন; হঠাৎ ওমরাহের মুখে এই কথা শুনে তাঁর মনে হল,—যদি ভীমসিংহকে ধরা যায়, তবে হয় তো সেই সঙ্গে রাণী পদ্মিনীও ধরা দিতে পারেন।

বাদশা শিবিরে এসে সমস্ত রাত্রি ভীমসিংহকে বন্দী করবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন। দু এক দিন পরেই রাণার সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হল যে, আল্লাউদ্দীন সমস্ত পাঠান-সৈন্য নিয়ে বিনা যুদ্ধে দিল্লীতে ফিরে যাবেন, তার বদলে একা মাত্র তিনি একখানি আয়নার ভিতরে রাজপুত রাণী পদ্মিনীকে একবার দেখতে পাবেন, আর চিতোরের কেল্লার ভিতর বাদশা যতক্ষণ একা থাকবেন ততক্ষণ তাঁর কোন বিপদ না ঘটে সে জন্য স্বয়ং মহারাণা দায়ী রইলেন। বাদশা চিতোরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। শিকার যে এত শীঘ্র ফাঁদে পা দেবে আল্লাউদ্দীন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি মহা আনন্দে পাঠান ওমরাহদের নিয়ে সমস্ত পরামর্শ স্থির কল্লেন। তার পর বৈকালে গোলাপ জলে স্নান করে, কিংখাবের জামা-জোড়া, মোতীর কণ্ঠমালা, হীরেপান্নার শিরপেঁজ পরে, শাহেনসা সাদা ঘোড়ার উপর সোনার রেকাবে পা দিয়ে বসলেন;—সঙ্গে প্রায় দুশোজন পাঠান বীর;—যারা প্রাণের ভয় রাখে না, যুদ্ধই যাদের ব্যবসা! বাদশা ঘোড়ায় চড়ে একা পাহাড় ভেঙে কেল্লার দিকে উঠে গেলেন; আর সেই পাঠান সওয়ারেরা পাহাড়ের নীচে থেকে প্রথমে নিজের শিবিরে ফিরে গেল, তারপর আবার একে একে সন্ধ্যার অন্ধকারে কেল্লার কাছে ফিরে এসে পথের ধারে প্রকাণ্ড একটা আমবাগানের তলায় লুকিয়ে রইল।

সূর্য্যদেব যখন চিতোরের পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড একখানা মেঘের আড়ালে অস্ত গেলেন, সেই সময় পাঠান বাদশা আল্লাউদ্দীন রাণা ভীম-সিংহের হাত ধরে পদ্মিনীর মহলে শ্বেত পাথরের রাজদরবারে উপস্থিত

হলেন। সেখানে আর জনমানব ছিল না,—কেবল হাজার হাজার মোম বাতির আলো, সেই শ্বেত পাথরের রাজমন্দিরে, যেন আর একটা নূতন দিনের সৃষ্টি করেছিল। রাণা ভীম সেই ঘরে সোনার মছ্‌নদে বাদশাকে বসিয়ে তাঁর হাতে এক পেয়ালা সরবৎ দিয়ে বল্লেন,—"শাহেনশা, একটু আমিল ইচ্ছা করুন।" আল্লাউদ্দীন সেই আমিলের পেয়ালা হাতে ভাবতে লাগলেন,—যদি এতে বিষ থাকে তবে তো সর্ব্বনাশ! রাজপুতের মেয়েরা, শুনেছি, শত্রুর হাতে অপমান হবার ভয়ে অনেক সময় এই রকম আমিল খেয়ে প্রাণ দিয়েছে। বাদশা পেয়ালা হাতে ইতস্তত করতে লাগলেন। রাণা ভীম আল্লাউদ্দীনের মনের ভাব বুঝে একটু হেসে বল্লেন,—"শাহেনশা, বিষের ভয় করবেন না। মহারাণা স্বয়ং যখন আপনার কোন বিপদ না ঘটে সে জন্য দায়ী, তখন আজ যদি আপনি সমস্ত চিতোর একা ঘুরে আসেন, তবু একজনও রাজপুত আপনার গায়ে হাত তুলতে সাহস পাবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অতিথিকে আমরা দেবতার মত মনে করি।" আল্লাউদ্দীন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—"রাণা আমি সে কথা ভাবছিনে। আমি ভাবছিলেম, আজ যেমন নির্ভয়ে আমি তোমার উপর বিশ্বাস করছি, তেমনি তুমিও আমাকে বিশ্বাস করতে পার কি না?" আল্লাউদ্দীন মুখে এই কথা বল্লেন বটে, কিন্তু সেই আমিলের পেয়ালায় চুমুক দিতে তাঁর প্রাণ কাঁপতে লাগল। তিনি অল্পে অল্পে সমস্ত আমিলটুকু নিঃশেষ করে অনেকক্ষণ চুপ্ করে বসে রইলেন। শেষে যখন দেখলেন বিষের জ্বালার বদলে তাঁর শরীর, মন বরং আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠল, তখন বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বল্লেন, —"তবে আর বিলম্ব কেন? এখন একবার সেই আশ্চর্য্য সুন্দরী পদ্মিনী রাণীকে দেখতে পেলেই খুসী হয়ে বিদায় হই!"

তখন রাণা ভীম আলিপো দেশের প্রকাণ্ড একখানা আয়নার সম্মুখ

থেকে একটা পর্দ্দা সরিয়ে নিলেন ;—কাকচক্ষু জলের মত নির্ম্মল সেই আয়নার ভিতর পদ্মিনীর রূপের ছটা, হাজার হাজার বাতির আলো যেন আলোময় করে, প্রকাশ হল। বাদশা দেখতে লাগলেন ;—সে কি কালো চোখ! সে কি সুটানা ভুরু! পদ্মের মৃণালের মত কেমন কোমল দুখানি হাত! বাঁকা মল-পরা কি সুন্দর ছোট দুখানি রাঙা পা! ধানী রংএর পেশোয়াজে মুক্তোর ফুল, গোলাপী ওড়নায় সোনার পাড়, পান্নার চুড়ী, নীলার আংটি, হীরের চিক্! বাদশা আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলেন,—একি মানুষ না পরী? আল্লাউদ্দীন আর স্থির থাকতে পাল্লেন না; তিনি মছ্‌নদ্ ছেড়ে সেই প্রকাণ্ড আয়নার ভিতর ছায়া-পদ্মিনীকে ধরবার জন্য দুইহাত বাড়িয়ে ছুটে চল্লেন,—গ্রহণের রাত্রে রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করতে যায়। ভীম-সিংহ বলে উঠলেন,—"শাহেনশা, পদ্মিনীকে স্পর্শ করবেন না।" রাণার মনে হল, রাজদরবারে একদিকে বসে সত্যই তাঁর পুণ্যবতী রাণী পদ্মিনী যেন পাঠানের হাতে অপমান হবার ভয়ে কাঁপছেন। রাগে রাণার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তিনি সেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে সোনার একটা পেয়ালা সেই আয়নাখানার ঠিক মাঝখানে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন ;—ঝন্ ঝন্ শব্দে সাত হাত উঁচু চমৎকার সেই আয়না চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। আল্লাউদ্দীন চমকে উঠে তিন পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি মনে মনে বুঝলেন, পাগলের মত রাণীর দিকে ছুটে যাওয়াটা বড়ই অভদ্রতা হয়েছে, এজন্য রাণার কাছে ক্ষমা চাওয়া দরকার। বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বল্লেন,—"রাণা, আমার অন্যায় হয়েছে, আমার মহলে এসে যদি কেউ এমন অভদ্রতা করত, তাহলে হয়তো আমি তার মাথা কেটে ফেল্‌তে হুকুম দিতুম,—আমায় ক্ষমা করুন।" তারপর, অনেক তোষামোদ, অনেক অনুনয়বিনয়ে রাণাকে সন্তুষ্ট করে গভীর রাত্রে আল্লাউদ্দীন ভীমসিংহের কাছে বিদায় চাইলেন।

পেয়ালার পর পেয়ালা আমিল খেয়ে একেই রাণার প্রাণ খুলে গিয়েছিল; তার উপর, দিল্লীর বাদশা তাঁর কাছে যখন ক্ষমা চাইলেন, তখন তাঁর মন একেবারে গলে গেল;—রাণা আদর করে নূতন বন্ধু দিল্লীর বাদশাকে কেল্লার বাইরে পৌঁছে দিতে চল্লেন।

অমাবস্যার রাত্রি, আকাশে শুধু তারার আলো, পৃথিবীতে কালো অন্ধকার। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ,—সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর নগরের লোক ঘুমিয়ে আছে; চিতোরের রাজপথে জনমানব নেই। আল্লাউদ্দীন সেই জনশূন্য রাজপথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, সঙ্গে রাণা ভীম আর কুড়ি জন রাজপুত সেপাই। আজ রাণার মনে বড় আনন্দ;—চিতোরের প্রধান শত্রু আল্লাউদ্দীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল, আর কখন চিতোরকে পাঠানের অত্যাচার সহ্য করতে হবে না। রাণা যখন ভাবলেন কাল সকালে পাঠান-সৈন্য চিতোর ছেড়ে চলে যাবে, যখন ভাবলেন চিতোরের সমস্ত প্রজা, কাল থেকে নির্ভয় হয়ে রাণা রাণীর জয় জয়কার দিয়ে, যে যার কাজে লাগবে, তখন তাঁর মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। তিনি মহা উল্লাসে বাদশার পাশে পাশে ঘোড়ায় চড়ে কেল্লার ফটক পার হলেন। তখন রাত্রি আরো অন্ধকার হয়েছে; পাহাড়ের গায়ে বড় বড় নিম গাছ, কালো কালো দৈত্যের মত, রাস্তার দুই ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আর কোথাও কোন শব্দ নেই, কেবল কেল্লার উপর থেকে এক একবার প্রহরীদের হৈ হৈ আর পাথরের রাস্তায় সেই বাইশটা ঘোড়ার খুরের খটাখট্।

আল্লাউদ্দীন ভীমসিংকে নিয়ে কথায় কথায় ক্রমে পাহাড়ের নীচে এলেন। সেখানে একদিকে জনারের ক্ষেত, আর একদিকে আমবাগান, মাঝে মেঠো রাস্তা। এই রাস্তার দুই ধারে প্রায় দুশো পাঠান আল্লাউদ্দীনের হুকুম মত লুকিয়ে ছিল। ভীমসিংহ যেমন এইখানে এলেন,

অমনি হঠাৎ চারিদিক থেকে পাঠান-সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেল্লে; তারপর সেই অন্ধকার রাত্রে শত শত শত্রুর মাঝে কুড়ি জন মাত্র রাজপুত তাদের রাণাকে উদ্ধার করবার জন্য প্রাণপণে যুঝতে লাগল। কিন্তু বৃথা! বাজপাখী যেমন ছোঁ মেরে শিকার নিয়ে যায়, তেমনি পাঠান আল্লাউদ্দীন, রাজপুতদের মাঝখান থেকে, রাণা ভীমকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। কুড়ি জনের মধ্যে পাঁচজন মাত্র রাজপুত চিতোরে ফিরল! প্রতিপদের সকাল বেলায় সমস্ত চিতোরে রাষ্ট্র হল,—ভীমসিংহ বন্দী হয়েছেন। পদ্মিনীকে না দিলে তাঁর মুক্তি নাই।

আল্লাউদ্দীন যখন শিবিরে পৌছিলেন, তখন রাত্রি আড়াই প্রহর। তিনি ভীমসিংহকে সাবধানে বন্ধ রাখতে হুকুম দিয়ে নিজের কানাতে বিশ্রাম করতে গেলেন। আজ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, রাণা যখন ধরা পড়েছেন, তখন পদ্মিনী আর কোথায় যায়। হিন্দুর মেয়ে স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে পারে, বাদশার বেগম হতে কি রাজি হবে না? পদ্মিনীকে না পেলে রাণাকে কিছুতেই ছাড়া হবে না! আল্লাউদ্দীন মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করে সোনার খাটিয়ায় দুধের ফেনার মত ধপ্‌ধপে বিছানায় শুয়ে হিন্দুরাণী পদ্মিনীর কথা ভাবতে ভাবতে শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকাল হলে বাদশা মনে ভাবলেন, এইবার পদ্মিনী আসছেন। সকাল গিয়ে দুপুর কেটে সন্ধ্যা হল, পদ্মিনী এলেন না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চলে গেল, তবু পদ্মিনীর দেখা নাই। বাদশা অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হতে লাগল,—এ ভীমসিং কি আসল ভীমসিং নয়? আমি কি ভুল করে সামান্য কোন সর্দারকে বন্দী করে এনেছি? আল্লাউদ্দীন বন্দী রাণাকে হুজুরে হাজির করতে হুকুম দিলেন। লোহার শিকলে বাঁধা রাণা ভীম, বাঁধা সিংহের মত, বাদশার দরবারে উপস্থিত হলেন।

শাহেনশা জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমিই কি পদ্মিনীর ভীমসিংহ ?" রাণা উত্তর কল্লেন,—"পাঠান। এতে তোমার সন্দেহ হচ্চে কেন ?" আল্লাউদ্দীন বল্লেন,—"যদি তুমি সত্যই ভীমসিংহ, তবে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্য রাজপুতদের কোনই চেষ্টা দেখছি না যে ?" রাণা বল্লেন,—"যে মূর্খ নিজের বুদ্ধির দোষে মিথ্যাবাদী পাঠানের হাতে বন্দী হয়েছে। তার সঙ্গে চিতোরের মহারাণা, বোধ হয়, আর কোন সম্বন্ধ রাখতে চান না।" কথাটা শুনে বাদশার মনে খটকা লাগল,—যদি সত্যই ভীমসিংহকে পাঠানের হাতে ছেড়ে দিয়ে মহারাণা নিশ্চিন্ত থাকেন। আল্লাউদ্দীন মহা ভাবিত হয়ে দরবার ছেড়ে উঠে গেলেন।

সেই দিন শেষরাত্রে চিতোরের উপরে কেল্লার খোলা ছাতে পদ্মিনী গালে হাত দিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন। নীল পদ্মের মত তাঁর দুটি সুন্দর চোখ, পাঠান শিবিরের দিকে—যেখানে ভীমসিং বন্দী ছিলেন সেই দিকে—চেয়ে ছিল। আকাশ তখনও পরিষ্কার হয় নি, পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের আলো সোনার তারের মত দেখা দিয়েছে মাত্র, এমন সময় দুজন রাজপুত-সর্দ্দার পদ্মিনীর পায়ে এসে প্রণাম কল্লেন। একজনের নাম গোরা, আর একজনের নাম বাদল। গোরার বয়স পঞ্চাশের উপর, আর তার বড় ভায়ের ছেলে বাদলের বয়স বছর বারো। গোরা, বাদল দুজনেই পদ্মিনীর বাপের বাড়ির লোক। রাজকুমারী পদ্মিনী যখন ভীমসিংহের রাণী হয়ে সিংহল ছেড়ে চলে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে এই গোরা এক হাতে তলোয়ার, আর হাতে মা-বাপ-হারা কচি বাদলকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চিতোরে এসেছিলেন। পদ্মিনী জিজ্ঞাসা কল্লেন,—"মহারাণা কি আমার কথা মত কাজ করতে রাজি হয়েছেন ?" গোরা বল্লেন,—"তাঁরি হুকুমে রাণীজীকে পাঠান-শিবিরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করার জন্য এখনি বাদশার সঙ্গে দেখা করতে

চলেছি।" পদ্মিনী একটুখানি হেসে বল্লেন,—"যাও, বাদশাকে বোলো, আমার জন্য দিল্লিতে একটা নূতন মহল বানিয়ে রাখেন।"

গোরা, বাদল বিদায় নিলেন। দেখতে দেখতে সমস্ত পৃথিবী প্রকাশ করে সূর্য্যদেব উদয় হলেন। পদ্মিনী দেখলেন, আল্লাউদ্দীনের লাল রেশমের প্রকাণ্ড শিবির সকাল বেলার সূর্য্যের আলোয় ক্রমে ক্রমে রক্তময় হয়ে উঠল। তিনি সেই বাদশাহের কানাতের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে উঠলেন,—"ধূর্ত্ত পাঠান, তোতে আমাতে আজ যুদ্ধ আরম্ভ হল, দেখি। কার কতদূর ক্ষমতা।"

সেদিন শুক্রবার, মুসলমানদের জুম্মা। আল্লাউদ্দীন ফজরের নমাজ শেষ করে দরবারে বসেছেন, এমন সময় মহারাণার চিঠি নিয়ে গোরা, বাদল উপস্থিত হলেন। বাদশা মহা আনন্দে মহারাণার মোহর-করা চিঠি হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন। তাতে লেখা রয়েছে,—পদ্মিনীকে বাদশার হাতে দেওয়াই স্থির হল, তার বদলে রাণা ভীমসিংহের মুক্তি চাই। আরও, রাজরাণী পদ্মিনী সামান্য স্ত্রীলোকের মত দিল্লীতে যেতে পারেন না, তাঁর প্রিয় সখীরাও যাতে পদ্মিনীর সঙ্গে থেকে চিরদিন তাঁর সেবা করতে পারেন, বাদশাহ সে বন্দোবস্ত করবেন; তাছাড়া চিতোরের রাণী পদ্মিনীকে শাহেন্‌শার শিবিরে পৌঁছে দেবার জন্য যে সব বড় বড় ঘরের রাজপুতনী সঙ্গে যাবেন, তাঁদের যাতে কোন অসম্মান না হয়, সেজন্য বাদশা তাঁর সমস্ত সৈন্য কেল্লার সামনে থেকে কিছুদূরে সরিয়ে রাখবেন। শেষে, মহারাণার এই ইচ্ছে যে, এর পর থেকে আল্লাউদ্দীন আর যেন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা না করেন। চিঠিখানা পড়ে বাদশার মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল;—তিনি হাসিমুখে গোরা ও বাদলের দিকে ফিরে বল্লেন,—"বেশ কথা। আমি আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত ফৌজ কেল্লার সামনে থেকে উঠিয়ে নেব, রাণীর আসবার কোনই

বাধা হবেনা। তোমরা মহারাণাকে জানাওগে তাঁর সকল কথাতেই আমি রাজি হলেম।"

গোরা, বাদল বিদায় হলেন। বাদশা, কেল্লার সামনে থেকে, সমস্ত সৈন্য উঠিয়ে নিতে হুকুম দিলেন। একদিনের মধ্যে এত সৈন্য অন্য জায়গায় উঠিয়ে নেওয়া সহজ নয়। বাদশা বল্লেন,—তাম্বুকানাত, গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্র যেখানকার সেইখানেই থাক, কেবল সেপাইরা নিজের ঘোড়া নিয়ে এক দিনের মত অন্য কোথাও আশ্রয় নিক্। তাতেও প্রায় সমস্ত রাত কেটে গেল।

পরদিন, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিতোরের প্রধান ফটক রামপোলের উপর কড়কড় শব্দে নাকরা বাজতে লাগল। বাদশা দেখলেন, চিতোরের সাতটা ফটক একে একে পার হয়ে, চার চার বেহারার কাঁধে, প্রায় সাতশ', ডুলি তাঁর শিবিরের দিকে আসছে;—মাঝে রাণী পদ্মিনীর চিনাপোত-মোড়া সোনার চতুর্দ্দোল, তার এক পাশে পঞ্চাশ বৎসরের সর্দ্দার গোরা, আর এক পাশে বারো বৎসরের বালক বাদল,—দুজনেই ঘোড়ায় চড়ে। বাদশা, পদ্মিনী আর তাঁর সহচরীদের থাকবার জন্য, প্রায় আধ ক্রোশ জুড়ে কানাত ফেলেছিলেন। একে একে যখন সেই সাতশ' পাল্কি কানাতের ভিতর পৌঁছিল, তখন গোরা, বাদশার হুজুরে খবর জানলেন,—"শাহেনশা, রাণীজি উপস্থিত, এখন তিনি একবার ভীমসিংহের সঙ্গে দেখা করতে চান,—বাদশাহের বেগম হলে আর তো দুজনে দেখা হবেনা।" বাদশা বল্লেন,—"পদ্মিনী যখন রাণাকে দেখতে চেয়েছেন, তখন আর কথা কি? আমি আধ ঘণ্টা সময় দিলেম, তার বেশি রাণা যেন পদ্মিনীর কাছে না থাকেন।" গোরা তথাস্তু বলে বিদায় হলেন।

আল্লাউদ্দীন একলা বসে দেখতে লাগলেন—এক দুই করে প্রায়

সাতশ' পাল্কি কানাতের ভিতর থেকে বেরিয়ে চিতোরের মুখে চলে গেল, সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বাব বৎসবের বাদল। বাদশা একজন ওমরাহকে জিজ্ঞাসা কল্লেন,—"এসব পাল্কিতে কারা যায়?" শুনলেন, চিতোর থেকে যে সকল বড় ঘরের রাজপুতনী রাণীকে বিদায় দিতে এসেছিলেন, তাঁরা ফিবে গেলেন। বাদশা জিজ্ঞাসা কল্লেন,—"ভীমসিং কোথায়?" উত্তর হল—"অন্দরে আছেন।"

আল্লাউদ্দীন শিবিরের এক কোনে বালির ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে। এইবার পদ্মিনীর সঙ্গে দেখা হবে। বাদশা সাজগোজ কববাব জন্য, অন্য এক শিবিরে উঠে গেলেন। সেখানে আতরগোলাপ, হীরেজহরতেব ছড়াছড়ি!—কোথাও সোনার আতর-দানে হাজাব-টাকা-ভবি গোলাপী আতর, কোথাও মুক্তোর তাজ, পান্নার শিরপেঁচ, কৌটো ভবা মাণিকের আংঠী, আলনায় সাজান কিংখাবের জামাজোড়া, রেশমী রুমাল, জরীর লপেটা!

বাদশা যতক্ষণ কিংখাবের জামাজোড়া, জরীর লপেটা পোরে আয়নার সম্মুখে বসে পাকা দাড়িতে গোলাপী আতর লাগাচ্ছিলেন, ততক্ষণ সেই সাতশ' পাল্কির একখানিতে রাণা ভীমসিংহকে লুকিয়ে মেবারের বাছা রাজপুত-সর্দারেরা পাঠান-শিবিরের মাঝখান দিয়ে চিতোরের মুখে এগিয়ে চলেছিলেন। ক্রমে আল্লাউদ্দীনেব সাজগোজ সাঙ্গ হল। আধ ঘণ্টা শেষ হয়ে এক ঘণ্টা পূর্ণ হতে চলো, এখনও পদ্মিনীর শিবির থেকে ভীমসিং ফিরে এলেন না! বাদশা গোরাকে ডাকতে হুকুম দিলেন; গোরার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না! আল্লাউদ্দীন আর স্থির থাকতে পাল্লেন না, ব্যস্তসমস্ত হয়ে যেখানে আধ ক্রোশ জুড়ে কানাত খাটান হয়েছিল, সেইখানে উপস্থিত হলেন; দেখলেন,—পদ্মিনীর সোনার চতুর্দ্দোল শূন্য পড়ে আছে। যে লাল মখমলের প্রকাণ্ড শিবিরে তিনি

চিতোরের রাণী পদ্মিনীকে মাণিকের খাঁচায় সোনার পাখিটির মত পুষে রাখবেন ভেবেছিলেন, সে শিবির অন্ধকার। কোথায় পদ্মিনী, কোথায় তাঁর একশ' সখী, আর কোথায় বা বন্দী রাণা ভীমসিংহ! পাঠান শিবিরে হুলুস্থূল পড়ে গেল। সকলেই শুন্‌লে, পাল্কিবেহারা সেজে রাজপুতেরা বন্দী রাণাকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেল।

বাদশা তখনি সমস্ত সৈন্য জড় করতে হুকুম দিয়ে দুহাজার ঘোড়-সওয়ার সঙ্গে চিতোরের মুখে বেরিয়ে গেলেন। সবেমাত্র রাণার পাল্কি চিতোরের ফটক পার হয়েছে, এমন সময়, পাঠান বাদশার ঘোড়-সওয়ার কালবৈশাখের ঝড়ের মতন ধূলিধ্বজায় চারিদিক অন্ধকার করে, দীন্-দীন্-শব্দে রাজপুত-সৈন্যের উপর এসে পড়ল। তখন বেলা দুই প্রহর। আগুনের সমান তপ্ত রৌদ্রে বারো বৎসরের বালক বাদল আর পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ গোরা, একদল রাজপুতকে নিয়ে, প্রাণপণে চিতোরের সিংহদ্বার রক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু যুদ্ধ শেষ হলনা। চিতোর থেকে দলের পর দল রাজপুত এসে সেই যুদ্ধে যোগ দিতে লাগল। বাদশা হাজারের পর হাজার পাঠান এনেও চিতোরের একখানা পাথর পর্য্যন্ত দখল করতে পাল্লেন না। শেষে, যে ভীমসিংহকে তিনি কাল রাত্রে লোহার শৃঙ্খলে বন্ধ বেধেছিলেন, সেই ভীমসিংহ যখন হাতীর পিঠে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন, তখন পাঠান-বাদশার আশা-ভরসা নির্ম্মূল হল। সন্ধ্যার অন্ধকারে অর্দ্ধেক ভারতবর্ষের সম্রাট আল্লাউদ্দীন চিতোরে সম্মুখ থেকে ঘোড়া ফিরিয়ে শিবিরে গেলেন। জয়-জয়-রবে চিতোর নগর পরিপূর্ণ হল।

সেইদিন গভীর রাত্রে যুদ্ধ শেষে রাণা ভীমসিংহ যখন পদ্মিনীর শয়নকক্ষে বিশ্রাম করতে এলেন, তখন রাণার দুই চক্ষে জল দেখে পদ্মিনী জিজ্ঞাসা কল্লেন,—"এ সুখের দিনে চক্ষে জল কেন?" রাণা

নিশ্বাস ফেলে বল্লেন,—"পদ্মিনী, আজ আমার পরম-উপকারী চিরবিশ্বাসী গোরা, -চিরদিনের মত যুদ্ধের খেলা সাঙ্গ করে, দেবলোকে চলে গেছে।" দুজনে আর একটিও কথা হলনা। রাণী পদ্মিনী শয়ন-ঘরের প্রদীপ অন্ধকার করে দিলেন;—দক্ষিণের হাওয়ায় সারারাত্রি চিতোরের মহাশ্মশানের দিক থেকে একটা যেন হায়-হায়-হায়-হায়-শব্দ সেই ঘরের ভিতর ভেসে আসতে লাগল।

আল্লাউদ্দীন যখন পদ্মিনীর আশায় চিতোর ঘিরে বসেছিলেন, সেই সময় কাবুল থেকে মোগলের দল একটু একটু করে ক্রমেই ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছিল। রাজপুতের কাছে হার মেনে বাদশা নিজের শিবিরে এসে শুনলেন,—মোগল বাদশা তৈমুর লং দিল্লী আক্রমণ করতে আসছেন। সেই সঙ্গে দিল্লী থেকে পিয়ারী বেগমের এক পত্র পেলেন, তার এক জায়গায় বেগম লিখেছেন,—"শাহেনশা, আর কেন? পদ্মিনীর আশা পরিত্যাগ করুন। হে মধুকর, তুমি পদ্মের সন্ধানে মরুভূমির মাঝে ফিরতে লাগলে, আর বনের ভাল্লুক এসে তোমার সাধের মৌচাক্ লুটে গেল! সকলি আল্লার ইচ্ছা! আজ অর্দ্ধেক ভারতবর্ষের রাজা, কাল হয়তো পথের ভিখারী! হায়রে হায়, দিল্লীর পিয়ারী বেগমকে এতদিনে বুঝি মোগল-দস্যুর বাঁদী হতে হল!" বাদশা পিয়ারীর চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হলেন। বিপদ যে এত গুরুতর তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। আল্লাউদ্দীন তৎক্ষণাৎ শিবির উঠাতে হুকুম দিলেন। সেই রাত্রে পাঠান-ফৌজ রাজস্থান ছেড়ে কাশ্মীরের মুখে চলে গেল।

* * * *

তের বৎসর পরে, চিতোরের সম্মুখে পাঠান-বাদশার রণডঙ্কা আর একবার বেজে উঠল। তখন চিতোরের বড় দুরবস্থা। সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষে, মহামারিতে উজাড় হয়ে যাচ্ছে,—দেশ প্রায় বীরশূন্য; নূতন

নূতন লোকের হাতে যুদ্ধের ভার। রাণা ভীমসিংহ সেই সব নূতন সৈন্য, নূতন সেনাপতি নিয়ে গ্রামে গ্রামে, পথে পথে পাঠান-সৈন্যকে বাধা দিতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। যুদ্ধের পর যুদ্ধে রাজপুতদের হটিয়ে দিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম, কেল্লার পর কেল্লা, দখল করতে করতে একদিন আল্লাউদ্দীন চিতোরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। বাদশাহী ফৌজ, চিতোরের দক্ষিণে, পাহাড়ের উপর গড়বন্দী তাম্বু সাজিয়ে, রাজপুতের সঙ্গে, শেষ যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এবার প্রতিজ্ঞা, চিতোরের কেল্লা ভূমিসাৎ না করে দিল্লী ফেরা নয়!

মলিনমুখে রাণা ভীমসিংহ চিতোর-গড়ে ফিরে এলেন। মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ রাজসভায় ভীমসিংহকে ডেকে বল্লেন,—"কাকাজী, এত দিনে বুঝি চিতোর-গড় পাঠানের হস্তগত হয়, আর উপায় নাই! প্রজাসকল হাহাকার করছে, সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষে উজাড় হয়ে যাচ্ছে, তার উপর এই বিপদ উপস্থিত। এখন কি নিয়ে, কাকে নিয়েই বা লড়াই করি?" ভীমসিংহ বল্লেন,—"চিতোর এখনও বীরশূন্য হয়নি, এখনও আমরা এক বৎসর পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে পারি, এমন ক্ষমতা রাখি।" লক্ষ্মণসিংহ ঘাড় নাড়লেন,—"কাকাজী, আর যুদ্ধ বৃথা! আমি বেশ বুঝতে পারছি, পাঠানের সঙ্গে সন্ধি না করলে আর রক্ষা নাই; তবে কেন এই দুর্ভিক্ষের দিনে সমস্ত দেশ জুড়ে যুদ্ধের আগুন জ্বালাই? সমস্ত প্রজা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আমার ক্ষতিতে রাজ্যে যদি শান্তি আসে, যদি আগুন নিভে যায়, তবে পাঠানের সঙ্গে সন্ধি করায় ক্ষতি কি? না হয়, কিছুকাল, পাঠান-বাদশার একজন তালুকদার হয়েই কাটালেম?" ভীমসিংহের দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল, তিনি মহারাণার দুটি হাত ধরে বল্লেন,—"হায়, লছমন্, মনে বেশ বুঝছি আর উপায় নাই, তবু আমার একটি অনুরোধ আছে। দুই বৎসর বয়সে

যখন তোর মা গেলেন, বাপ গেলেন, তখন আমিই তোকে ছেলের মত বুকে টেনে নিয়েছিলেম; সমস্ত বিপদ-আপদ, রাজ্যের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা তোরি হয়ে অকাতরে সহ্য করেছিলেম। আজ আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর। বৎস! সাত দিন সময় দে। আমি এই শেষবার চিতোর-উদ্ধারের চেষ্টা দেখি। এই সাত দিন যেন পাঠানের সঙ্গে সন্ধি না হয়, এই সাত দিনে যেন আমার হুকুম মহারাণার হুকুম জেনে সকলে মান্য করে।" লক্ষ্মণসিংহ বল্লেন,—"তথাস্তু।"

সেই দিন থেকে ভীমসিংহের হুকুম মত এক এক জন রাজপুত-সর্দার পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে লাগলেন। প্রতিদিন খবর আসতে লাগল,—আজ অমুক রাজকুমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন, আজ অমুক সামন্ত বন্দী হলেন;—চিতোরের ঘরে ঘরে হাহাকার উঠল। সেই হাহাকার, সেই হাজার হাজার অনাথ শিশু আর বিধবার ক্রন্দন, পদ্ম-সরোবরের মাঝখানে, যেখানে রাজরাণী পদ্মিনী শ্বেত-পাথরের দেব-মন্দিরে পূজায় বসেছিলেন, সেইখানে, পৌঁছল। পদ্মিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পূজা সাঙ্গ কল্লেন। তাঁর কোমল প্রাণ সেই সব দুঃখী পরিবার, অনাথ শিশুর জন্য সারা দিন, সারা সন্ধ্যা কেবলি কাঁদতে লাগল। ভীমসিংহ যখন মহলে এলেন, তখন পদ্মিনী দুই হাত জোড় করে বল্লেন,—"প্রভু, আর কত দিন যুদ্ধ চলবে?" ভীমসিংহ বল্লেন,—"তিন দিন মাত্র। কিন্তু যুদ্ধে আর কোন ফল নাই,—রাজপুতের প্রাণে সে উৎসাহ আর নাই। এখন উপায় কি? সূর্য্যবংশের মহারাণাকে এইবার বুঝি পাঠান-বাদশার তালুকদার হতে হল।" পদ্মিনী জিজ্ঞাসা কল্লেন,—"প্রভু, চিতোর রক্ষার কি কোনই উপায় নাই?" ভীমসিংহ বল্লেন,—"উবর দেবী যদি কৃপা করেন তবেই রক্ষে! হায় পদ্মিনী, কার পাপে চিতোরের এ দুর্দ্দশা হল?" তারপর, দু' একটি কথার পর ভীমসিংহ অন্য কাজে চলে গেলেন।

একা ঘরে পদ্মিনীর কানে কেবলি বাজতে লাগল,—হায়, পদ্মিনী, কার পাপে আজ চিতোরের এ দুর্দ্দশা! অন্ধকারে পদ্মিনী কপালে করাঘাত করে বলে উঠলেন,—"হায়, হতভাগিনী পদ্মিনী, তোরি এ পোড়া রূপের জন্য এ সর্ব্বনাশ, তোরি জন্য এ সর্ব্বনাশ!" নিঃশব্দ ঘরে প্রতিধ্বনি হল,—তোরি জন্য এ সর্ব্বনাশ! ঠিক সেই সময় চৈতমাসের পরিষ্কার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নাবল। পদ্মিনী একটা মোটা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে নিজের মহল থেকে চিতোরেশ্বরী উবর দেবীর মন্দিরে একা চলে গেলেন। রাত্রি দুই প্রহর, উবর দেবীর মন্দিরে সমস্ত আলো নিভে গেছে, কেবল একটি মাত্র প্রদীপের আলো। সেই আলোয় বসে দেবীর ভৈরবী, রাজরাণী পদ্মিনীকে বল্লেন,—"মহারাণী, আমি আবার বলি, তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ, তার শেষ হচ্ছে মৃত্যু! দেবীর রত্ন-অলঙ্কার একবার অঙ্গে পরলে আর নিস্তার নাই। ছয় মাসের মধ্যে জীবন্ত-অবস্থায় জলন্ত-আগুনে দগ্ধ হতে হবে।" পদ্মিনী বল্লেন,—"হে মাতাজী, আশীর্ব্বাদ করুন, যে রূপসীর জন্য রাজস্থানে আজ এ আগুন জ্বলেছে, তার সেই পোড়া রূপ জলন্ত আগুনেই ভস্ম হোক।" ভৈরবী বল্লেন,—"তবে তাই হোক। বৎস, আমি এই আশীর্ব্বাদ করি, যে চিতোরের জন্য তুমি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করলে, সেই চিতোরে তোমার নাম চিরদিন যেন অমর থাকে; যে মহাসতীর রত্ন অলঙ্কার আজ তুমি পরতে চল্লে, সেই মহাসতী মরণান্তে তোমায় যেন চরণে রাখেন।" রাণী পদ্মিনী ভৈরবীর হাত থেকে একটি চন্দন কাঠের কৌটায় উবর দেবীর সমস্ত রত্ন-অলঙ্কার নিয়ে বিদায় হলেন।

সেই দিন রাত্রি আড়াই প্রহরে চিতোরের রাজপ্রাসাদে একটুখানি সাড়াশব্দ ছিল না;—মহারাণা নির্জ্জন ঘরে একা ছিলেন। যখন তাঁর সমস্ত প্রজা, পাঠানের সঙ্গে সন্ধি হবে, দেশে শান্তি আসবে, মনে করে,

নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছিল, সেই সময় সমস্ত মেবারের রাজা ভগবান এক-লিঙ্গের দেওয়ান মহারাণা লক্ষণসিংহের চোখে ঘুম ছিল না। হায় অদৃষ্ট! কাল সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিতোর ছেড়ে যেতে হবে, এ জীবনে আর হয়তো ফেরা হবে না। রাজ্য, সম্পদ, মান, মর্য্যাদা, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে কোন্ দূরদেশে সামান্য বেশে নির্ব্বাসনে যেতে হবে। মহারাণা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন;—ঘরের এক কোনে সোনার দীপদানে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছিল, প্রকাণ্ড ঘরের আর সমস্তটা অন্ধকার। খিলানের পর খিলান, থামের পর থামের সারি অন্ধকার থেকে গাঢ় অন্ধকারে মিশে গেছে;—একটি মাত্র প্রদীপের আলোয় নিঃশব্দ সেই প্রকাণ্ড ঘর আরও যেন অন্ধকার বোধ হতে লাগল। মহারাণা অন্তঃপুরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন; হঠাৎ পায়ের তলায় মেঝের পাথরগুলো একবার যেন কেঁপে উঠলো; তারপর মহারাণা অনেকখানি ফুলের গন্ধ আর অনেক নুপুরের ঝিনি-ঝিনি শব্দ পেলেন। কারা যেন অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহারাণা বলে উঠলেন,—"কে তোরা? কি চাস্?" চারিদিকে দেওয়ালের ভিতর থেকে, ছাতের উপর থেকে, পায়ের নীচে থেকে শব্দ উঠল,—"ময় ভুখা হুঁ।" লক্ষণসিংহ বল্লেন,—"আঃ, এত রাত্রে চিতোরের রাজপ্রাসাদে উপবাসে কে জাগে?" আবার শব্দ উঠল—"ময় ভুখা হুঁ।" তার পর, গাঢ় ঘুমের মাঝখানে স্বপ্ন যেমন ফুটে উঠে, তেমনি সেই শয়ন-ঘরের অন্ধকারে এক অপরূপ দেবীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে ফুটে উঠল। মহারাণা বলে উঠলেন,—"কে তুমি? দেবতা না দানব, আমায় ছলনা করছ?" লক্ষণসিংহ দীপদান থেকে সোনার প্রদীপ উঠিয়ে ধরলেন। প্রদীপের আলো, দেবীর কিরীটকুণ্ডলে, রত্ন-অলঙ্কারে, অসংখ্য অসংখ্য মণি মাণিক্যে, হাজার হাজার আগুনের শিখার মত, দপ্ দপ্ করে জ্বলতে লাগল।

লক্ষ্মণসিংহ দেখলেন,—চিতোরেশ্বরী উবর দেবী। ভয়, ভক্তি, বিস্ময়ে মহাবাণাব সর্ব্বশবীর অবশ হয়ে এল;—পবমানন্দে দুর্ব্বল তাঁর হাত থেকে সোনার প্রদীপ খসে পড়ল। তারপব, সব অন্ধকার। সেই অন্ধকারে মহাবাণা, স্বপ্ন দেখছেন, কি জেগে আছেন, বুঝতে পাল্লেন না। তিনি যেন শুনতে লাগলেন, দেবী বলছেন,—"ময়্ ভুখা হুঁ।—বড় ক্ষুধা, বড় পিপাসা, আমি মহাবলি চাই;—রক্ত না হলে এ পিপাসার শান্তি নাই। মহারাণা। ওঠো, জাগো, দেশের জন্য বুকের রক্তপাত কর;—আমার খর্পর রক্তের শত ধারায় পরিপূর্ণ কর। রাজাপ্রজা, বালকবৃদ্ধ যদি চিতোরেব জন্য প্রাণ উৎসর্গ কবে, তবেই কল্যাণ; না হলে, সূর্য্যবংশেব রাজপরিবার আর কখন চিতোরের সিংহাসন পাঠানের হাত থেকে ফিরে পাবে না!" পর্ব্বতের গুহায় প্রতিধ্বনি যেমন ঘুবতে থাকে, তেমনি সেই প্রকাণ্ড ঘবে দেবীব শেষ কথা অনেকক্ষণ ধরে গম্ গম্ করতে লাগল। বাত্রি শেষ হয়ে গেল। উষাকালে সোনাব আলো আর শীতল বাতাসের মাঝখানে চিতোরেশ্বরী কোথায় অন্তর্দ্ধান হলেন। অনেক দূবে পার্ব্বতী-মন্দিরে নহবতের সুরে ভৈরবী বাগিণীতে মহাদেবীর স্তুতি-গান বাজতে লাগল।

প্রত্যূষে, রাজদরবারে মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ যখন রাত্রেব ঘটনা আর দেবীর আদেশ সকলের সম্মুখে প্রকাশ কল্লেন, তখন সকলে বিস্মিত হল বটে, কিন্তু অনেকেই সে কথা বিশ্বাস করলে না। যাদের হৃদয়ে বিশ্বাস অটল, ভক্তি অচলা ছিল, যারা চিতোবের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তারা উৎসাহে উন্মত্ত হয়ে উঠল, আর যাদেব প্রাণ নিরুৎসাহ, মন দুর্ব্বল, যারা পাঠানেব সঙ্গে সন্ধি হলে সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটাবে ভেবেছিল, তারা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। কিন্তু সেই রাত্রে মহারাণার আদেশে মেবারের ছোটবড় সামন্ত-সর্দ্দারেরা যখন দেবীব নিজের মুখেব আদেশ শোনবার

জন্য অন্তঃপুরের সেই ঘরে একত্র হলেন, যখন দ্বিপ্রহরে শুদ্ধ বাজপুরে হাজার হাজার রাজপুত বীরের চোখের সম্মুখে আবার সেই দেবী-মূর্ত্তি "ময়্ ভুখা হুঁ" বলে প্রকাশ হল, তখন আর কারো মনে কোন সন্দেহ রইল না;—সকলের মন থেকে সমস্ত অবিশ্বাস, সকল দুর্ব্বলতা নিমিষের মধ্যে দূর হল;—আগুনের তেজে অন্ধকার যেমন দূরে যায়! সকলেই বীরত্বের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠল; কেবল রাণা ভীমসিংহ যেন সেই দেবী-মূর্ত্তির ভিতরে পদ্মিনীকে দেখে মনে মনে তোলাপাড়া করতে লাগলেন,—একি দেবী না পদ্মিনী! পদ্মিনী না দেবী!

তারপর, মহাবলির উদ্যোগ হল। মহারাণা লক্ষণসিংহ তাঁর বারোটি রাজপুত্রের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম, সব চেয়ে বড় রাজকুমার, যুবরাজ অরিসিংহের মাথায় চিতোরের রাজমুকুট দিয়ে বল্লেন,—"হে ভাগ্যবান্, দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য কর! পাঠানযুদ্ধে অগ্রসর হও! আজ তুমি সমস্ত মেবারের মহারাণা। এই সমস্ত সামন্ত-সর্দ্দার তোমারি প্রজা বলে জানবে। আজ থেকে তোমারি হাতে যুদ্ধের ভার। জয় হলে তোমার পুরস্কার ইহলোকে চিতোরের রাজসিংহাসন; আর যুদ্ধে প্রাণ গেলে তার ফল পরলোকে মহাদেবীর অভয় চরণ!" বৃদ্ধ রাণা লক্ষণসিংহ অরিসিংহকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে নীচে দাঁড়ালেন;—নতুন রাণার মাথায় চিতোরের কিরীট শোভা পেতে লাগল। চারিদিকে রব উঠল,—"জয় মহাদেবীর জয়, জয় অরিসিংহের জয়!" লক্ষণসিংহ বলতে লাগলেন,—"সর্দ্দারগণ, আমার আর একটি শেষ কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য দেবীর কাছে নয়, চিতোরের কাছে নয়; আমার পিতা পিতামহ স্বর্গীয় মহারাণাদের কাছে। এই মহা সমরে মেবারের রাজবংশ একেবারে নির্ম্মূল না হয়, পরলোকে পিতৃপুরুষেরা যাতে জল-গণ্ডূষ পান, রাজস্থানে বাপ্পার বংশ

যুগে যুগে যাতে অমর থাকে, সেই জন্য, আমার ইচ্ছা, অজয়সিংহ নিজের স্ত্রীপুত্র নিয়ে কৈলবায়ার নির্জ্জন দুর্গে চলে যান।"

লক্ষ্মণসিংহের বারো জন রাজপুত্রের মধ্যে কেবল অজয়সিংহেরই দুটি শিশু সন্তান ছিল। অজয়সিংহ মহারাণার সম্মুখে জোড় হাত করে বল্লেন,—"পিতা, আমার এগারো ভাই চিতোরের জন্যে যুদ্ধে প্রাণ দেবে, আর আমি কিনা স্ত্রীলোকের মত শিশুসন্তান মানুষ করবার জন্য বসে থাকব? আমি কি এতই দুর্ব্বল, এমনি অক্ষম?" লক্ষ্মণসিংহ বল্লেন,—"বৎস, হতাশ হয়োনা, যে মহৎ কাজের ভার তোমায় দিলেম, চিতোরের যে কোন রাজপুত সে ভার পেলে নিজেকে ধন্য বোধ করত! হয়তো আমাদের রক্তপাতে চিতোর উদ্ধার হবে না, হয়তো তোমাকেও চিতোরের জন্য প্রাণপণ করতে হবে। আমরা হয়তো চিতোরকে পরাধীন রেখে চলে যাব, আর হয়তো তুমি সূর্য্যবংশের উপযুক্ত কোন বীরপুরুষের হাতে রাজ্যভার দিয়ে পরম সুখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারবে! মনে রেখ, চিতোরের জন্য প্রাণ দেবার যে সুখ চিতোর পুনরুদ্ধারের সুখ তার শতগুণ।" লক্ষ্মণসিংহ নীরব হলেন। জয়-জয়-শব্দে রাজসভা ভঙ্গ হল।'

রাজসভা থেকে বিদায় নেবার সময় অরিসিংহ অজয়সিংহকে বলে গেলেন,—"চিতোর ছেড়ে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।" যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ করে অজয়সিংহ যখন বড় ভায়ের ঘরে গেলেন, তখন অরিসিংহ একখানি চিঠি শেষ করে ছোট ভাইয়ের দিকে ফিরে বল্লেন,—"ভাই আজ আমাদের শেষ দেখা, কাল তুমি একদিকে, আমি একদিকে! এই শেষ দিনে তোমায় একটি কাজের ভার দিচ্ছি।" অরিসিংহ চামড়ায় মোড়া একটি ছোট থলি আর সেই চিঠিখানি অজয়সিংহের হাতে দিয়ে বল্লেন,—"অজয়, এদুটি যত্ন করে রেখ, যদি আমি

যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি, তবে আবার চেয়ে নেব, নয়তো তুমি খুলে দেখো, আমার শেষ ইচ্ছা কি।" তারপর, অজয়সিংহকে আলিঙ্গন করে অরিসিংহ বল্লেন,—"চল ভাই, মায়ের কাছে বিদায় হই।

সেইদিন শেষ-রাত্রে যখন রাজ-অন্তঃপুর থেকে দুই রাজপুত্র দুই দিকে বিদায় হয়ে গেলেন, তখন বারো ছেলের মা-জননী চিতোরের মহারাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লেন,—তাঁর সমস্ত শরীর পাষাণের মত স্থির হয়ে গেল, কেবল সজল দুটি কাতর চোখ সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল—যেদিক দিয়ে দুটি রাজকুমার চলে গেলেন। মহারাণা বলতে লাগলেন,—"প্রিয়ে, স্থির হও, ধৈর্য্য ধর, বুক বাঁধ, মহাকালের কঠোর বিধান নত শিরে শান্ত মনে বহন কর।" তারপর রণরণ শব্দে রাজপুতের রণডঙ্কা দিক্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে বাজতে লাগল,—যুবরাজ অরিসিংহ যুদ্ধযাত্রা কল্লেন।

সেইদিন থেকে একমাস কেটে গেল। পাঠানের বিরুদ্ধে রাজপুতের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। একের পর এক, এগোরা জন রাজকুমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। আর আশা নাই, আর উপায় নাই। কিন্তু তবু রাজপুতের বীর-হৃদয় এখনও অটল রইল। চিতোরের শেষ দুই বীর, লক্ষ্মণসিংহ আর ভীমসিংহ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। রাণার হুকুমে মেবারের লক্ষ লক্ষ সৈন্যসামন্তের অবশেষ—ভীষণ মূর্ত্তি ভগবান একলিঙ্গের দশহাজার দেওয়ানী ফৌজ একত্র হতে লাগল। তাদের এক হাতে শূল, এক হাতে কুঠার, দুই কানে শাঁখের কুণ্ডল, মাথায় কালো ঝুঁটি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে বাঘছালের অঙ্গরাখা, পিঠে একটা করে প্রকাণ্ড ঢাল। তাদের আসবাবের মধ্যে এক ঘোড়া, এক কম্বল, এক লোটা,—পৃথিবীতে আপনার বলবার আর কিছুই ছিলনা। তারা দেবতার মধ্যে একমাত্র একলিঙ্গজীর উপাসনা করত, মানুষের

মধ্যে কেবল মাত্র মহারাণার হুকুম মানত। সমরসিংহ এই ফৌজের সৃষ্টিকর্ত্তা। ছোটখাট যুদ্ধে এদের কেউ দেখতে পেতনা, কেবল মাঝে মাঝে ঘোর দুর্দ্দিনে, যখন চারিদিকে শত্রু, চারিদিকে বিপদ ঘনিয়ে আসত, যখন বিধর্ম্মীর হাতে অপমান হবার ভয়ে দেশের যত সুন্দরী কি কুমারী, কি বিধবা, কি দশ বছরের কচিমেয়ে, কি ষোল বছরের পূর্ণ যুবতী চিতার আগুনে রূপযৌবন ছাই করে দিয়ে চিতোরেশ্বরীর সম্মুখে জীবনের শেষ ব্রত জহর ব্রত উদ্‌যাপন করত, যখন আর কোন আশা, কোন উপায় নাই, সেই সময়, হতাশ রাজপুতের শেষ উৎসাহের মত দুর্দ্ধর্ষ, দুর্দ্দান্ত এই দেওয়ানী ফৌজ চিতোরের কেল্লায় দেখা দিত। সত্তর বৎসর পূর্ব্বে সমরসিংহের বিধবা রাণী কর্ম্মদেবী একদিন কুতুবুদ্দিনের হাত থেকে ছেলের রাজসিংহাসন রক্ষা করবার জন্য মেবারের সমস্ত সৈন্য একত্র করেছিলেন, সেইদিন একবার দেওয়ানী ফৌজের ডাক পড়েছিল, আর আজ কয় পুরুষ পরে মহারাণা লক্ষণসিংহের হুকুমে দেওয়ানী ফৌজ আর একবার চিতোরের কেল্লায় উপস্থিত হল।

কালরাত্রি, তিথি অমাবস্যা যখন জগৎ-সংসার গ্রাস করেছিল, মাথার উপর থেকে চন্দ্রসূর্য্য যখন লুপ্ত হয়েছিল, সেই সময় চিতোরের মহাশ্মশানের মধ্যস্থলে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে বারোহাজার রাজপুত সুন্দরীর জহর-ব্রত আরম্ভ হল। মন্দিরের ঠিক সম্মুখে অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গের উপরে দাঁড়িয়ে রাজস্থানের প্রথম সুন্দরী রাণী পদ্মিনী অগ্নিদেবের স্তব আরম্ভ কল্লেন,—"হে অগ্নি, হে পবিত্র উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি, এসো। পৃথিবীর অন্ধকার তোমার আলোয় দূরে যাক। হে অগ্নি, হে মহাতেজ, এসো। তুমি দুর্ব্বলের বল, সবলের সহায়। হে দেবতা, হে ভয়ঙ্কর, আমাদের ভয় দূর কর, সন্তাপ নাশ কর, আশ্রয় দাও। লজ্জানিবারণ,

পদ্মিনীকর্তৃক অগ্নির স্তব

দুঃখবিনাশন, বহ্নিশিখা তুমি জীবনের শেষ গতি, বন্ধনের মহামুক্তি!" পদ্মিনী নীরব হলেন, বারো হাজার রাজপুতের মেয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগল,—"লাজহরণ তাপবারণ"—। হঠাৎ এক সময় মহা কল্লোলে চারিদিক পরিপূর্ণ করে হাজার হাজার আগুনের শিখা যেন মহা আনন্দে সেই সুড়ঙ্গের মুখে ছুটে এল। প্রচণ্ড আলোয় রাত্রির অন্ধকার টল্‌মল্‌ করে উঠল। বারো হাজার রাজপুতনীর সঙ্গে রাণী পদ্মিনী অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন,—চিতোরের সমস্ত ঘরের সমস্ত সোনামুখ, মিষ্টি কথা আর মধুর হাসি নিয়ে, এক নিমেষে, চিতার আগুনে, ছাই হয়ে গেল—সমস্ত রাজপুতের বুকের ভিতর থেকে চীৎকার উঠল,—"জয় মহাসতীর জয়—!" আল্লাউদ্দীন নিজের শিবিরে শুয়ে সে চীৎকার শুনতে পেলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত রাখতে হুকুম পাঠালেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিতোরের পাহাড় বেয়ে বর্ষাকালের স্রোতের মত রাজপুত সেনা হর-হর-শব্দে দিক দিগন্ত কাঁপিয়ে ভয়ঙ্কর তেজে পাঠান সৈন্যের উপর এসে পড়ল। আল্লাউদ্দীনের তাতার সৈন্য দেওয়ানী ফৌজের কুঠারের মুখে নিমেষের মধ্যে ছিন্নভিন্ন, ছারখার হয়ে পলায়ন কল্লে। আল্লাউদ্দীন নতুন নতুন সৈন্য এনে বারম্বার রাজপুতদের বাধা দিতে লাগলেন,—স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মত তাঁর সমস্ত চেষ্টা প্রতিবার বিফল হল। আল্লাউদ্দীন নিজে একজন সামান্য বীর পুরুষ ছিলেন না, এর চেয়ে ঢের কম সৈন্য নিয়ে তিনি মেবারের চেয়ে অনেক বড় বড় হিন্দু-রাজত্ব অনায়াসে জয় করেছেন; কিন্তু আজ যুদ্ধে রাজপুতের বীরত্ব দেখে তাঁকে ভয় পেতে হল। বারো বার তিনি সৈন্য সাজিয়ে রাজপুতদের বাধা দিলেন, বারো বার তাঁকে হটে আসতে হল। আল্লাউদ্দীন বেশ বুঝলেন, আজ যুদ্ধের

সহজে শেষ নাই। একদিকে দিল্লীর বাদশাহী তক্ত আর একদিকে চিতোরের রাজসিংহাসন ;—কোনটা থাকে, কোনটা যায় !

তখন বেলা তৃতীয় প্রহর, আল্লাউদ্দীন নিজের সমস্ত ফৌজ একবারে এক সময়ে সেই বারো হাজার রাজপুতের দিকে চালাতে হুকুম দিলেন। নিমেষের মধ্যে পাঠান বাদশার লক্ষ লক্ষ হাতীঘোড়া, সেপাইশাস্ত্রী, প্রলয়-ঝড়ের মত ধুলায় ধুলায় চারিদিক অন্ধকার করে, দীন্ দীন্ শব্দে রাজপুতের দিকে ছুটে আসতে লাগল। তারপর, হঠাৎ এক সময়, সমুদ্রের তরঙ্গে নদীর জল যেমন, তেমনি সেই অগনিত পাঠান সৈন্যের মাঝে কয়েক হাজার রাজপুত কোন্‌খানে লুপ্ত হল, কিছু আর দেখা গেল না। কেবল সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে সেই যুদ্ধ-রত অসংখ্য সৈন্যের মাথার উপরে সূর্য্যমূর্ত্তি লেখা চিতোরের রাজপতাকা একবার মাত্র সন্ধ্যার আলোয় বিদ্যুতের মত চমকে উঠল ; তার পরেই শব্দ উঠল,—"আল্লা হো আখবর শাহনশা কি ফতে।"—পাঠানের পায়ের তলায় মহারাণার রাজছত্র চূর্ণ হয়ে গেল। সূর্য্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে অস্ত গেলেন ;—রক্তমাংসের লোভে রণস্থলের উপর দলে দলে নিশাচর পাখী কালো ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে লাগল।

চিতোর হস্তগত হল। পাঠানের তলোয়ার চিতোরের পথঘাট রক্তের স্রোতে রাঙা করে তুল্লে, ধনধান্যে, মণিমুক্তায়, লক্ষ লক্ষ তাতার-ফৌজের বড় বড় সিন্দুক পরিপূর্ণ হল। কিন্তু যে রত্নের লোভে আল্লাউদ্দীন আজ অমরাবতীর সমান চিতোর নগর শ্মশান করে দিলেন, যার জন্য দিল্লীর সুখের সিংহাসন ছেড়ে বিদেশে এলেন, সেই পদ্মিনীর সন্ধান পেলেন কি ? বাদশা চিতোরে এসে প্রথমেই শুনলেন,—পদ্মিনী আর নাই—চিতার আগুনে সুন্দর ফুল ছাই হয়েছে। সেইদিন রাত্রে বাদশার হুকুমে চিতোরের ঘর, দ্বার, মন্দির, মঠ, ছাইভস্ম চূর্ণবিচূর্ণ

হয়ে গেল,—কেবল প্রকাণ্ড সরোবরের মাঝখানে রাণী পদ্মিনীর রাজ-মন্দির তেমনি নতুন, তেমনি অটুট রইল। আল্লাউদ্দীন সেই রাজমন্দিরে পদ্মসরোবরের ধারে শ্বেতপাথরের বারাণ্ডায় ঘেরা পদ্মিনীর শয়নমন্দিরে তিনদিন বিশ্রাম কল্লেন। তারপর, মালদেব নামে একজন রাজপুতের হাতে চিতোরের শাসনভার দিয়ে, ধীরে ধীরে দিল্লীর মুখে চলে গেলেন। পাঠান-বাদশার প্রবল প্রতাপ, হিন্দুস্থানের একদিক থেকে আর এক দিকে, বিস্তৃত হল; আর সেই বারো হাজার সতী-লক্ষ্মীর পবিত্র নাম, বারো হাজার রাজপুত-বীরের কীর্ত্তি, চিরদিনের জন্য, জগৎ-সংসারে ধন্য হয়ে রইল। আজও চিতোরে মহাসতীর শ্মশানে পদ্মিনীর সেই চিতাকুণ্ড দেখা যায়,—তার ভিতর মানুষে প্রবেশ করতে পারে না, একটা অজগর সর্প দিবারাত্রি সেই গহ্বরের মুখে পাহারা দিচ্ছে।